শ্রেষ্ঠ পত্র : সোমের প্রতি তারা

'বীরাঙ্গনা কাব্য' একাদশ পত্রিকার নির্মাল্য। একাদশ পত্রিকার একাদশ নায়িকা, তাঁদের প্রত্যেকের প্রকৃতি পৃথক, ব্যক্তিত্ব পৃথক, সমস্যা পৃথক, আকুতিও পৃথক। তাঁদের এইসব পার্থক্যের সমায়োজনেই এ কাব্য বৈচিত্র্যময়। এই বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকে কোনো একটি পত্রকে যখন শ্রেষ্ঠ বলতে চাই, তখন সংশ্লিষ্ট নায়িকার স্বতন্ত্র ব্যক্তিস্বরূপের মূল্যে পত্রটির মূল্যায়ন করি না, কারণ সে মূল্যায়ন যতখানি নীতির, কাব্যের মূল্যায়ন নয় ততটা। বৈচিত্র্যের মধ্যে কোনো নায়িকার পত্রকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিই কবির লক্ষ্য সে কতটা পূরণ করতে পেরেছে, কতটাই বা আলোকিত করে তুলেছে পুরানিক আধার, আর তার শিল্পায়নে কবিই-বা কতখানি পারঙ্গমতার পরিচয় দিতে পেরেছেন ইত্যাদি নিরিখ-নিকষে বিচার করে।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রাচীন পর্যালোচকেরা কিন্তু এই জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজেছেন অন্য নিরিখ থেকে। তাঁদের অধিকাংশেরই মনে হয়েছে এ কাব্যের শ্রেষ্ঠ পত্র জনার। আসলে কাব্যনামের 'বীরাঙ্গনা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ তাঁরা ভুলতে পারেননি, তাঁরা দেখেছেন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' কোনো নারীই অস্ত্র-হাতে লড়াইয়ের ময়দানে নামেননি, জনা ছাড়া আর কারও মধ্যে সংগ্রামের স্পৃহা পর্যন্ত নেই। জনাই কেবল তীব্র অপত্য বেদনায় স্বামীকে পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নিতে উদ্দীপিত করে তুলতে চেয়েছেন। সুতরাং বীরাঙ্গনার বৈশিষ্ট্য যদি ছিঁটেফোটাও কারও মধ্যে থাকে, তিনি জনা। অতঃপর তাঁরা জনার মাতৃবেদনা, স্বামীর প্রতি যুগপৎ ক্ষোভ ও সমবেদনা, জনার বাকচাল, তথ্যবিশ্লেষণী শক্তি, প্রতিবাদের অনমনীয়তা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন।

কিন্তু ভুললে চলবে না যে, রেনেসাঁসের শতকে অস্ত্রধারিণী রণরঙ্গিনী নারীর আদর্শ (model) প্রয়োজন ছিল না; রণনিপুণা নারীও যদি মানসিক দিক থেকে তমসাবৃত হন, যদি অসংখ্য কুসংস্কার আর অসার বিশ্বাসে আচ্ছন্ন থাকে তাঁর মন তবে মাইকেলের অভিধায় তিনি বীরাঙ্গনার সম্মান পাবেন না। মাইকেল মনে করেন কুসংস্কার আর অসার বিশ্বাসের অক্টোপাস থেকে যে নারীর মন মুক্তি পেয়েছে সে-নারীই বীরাঙ্গনা। বীরত্ব বা বীর্যের অধিষ্ঠান বাহুতে নয়, মনে। মনে, মননে, আর মননজাত সিদ্ধান্তের নির্ভীক প্রকাশে। সন্দেহ নেই, এদিক থেকেও জনা অনেকটাই বীরাঙ্গনা। তা যদি তিনি না-ই হবেন তবে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' মাইকেল তাঁকে স্থান দিলেন কেন! তথ্যোপস্থাপনা এবং তার যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে, ক্ষুরধার বাগবিস্তার এবং প্রতিবাদের অনমনীয়তায় জনার ব্যক্তিত্বের দীপ্তি পাঠকমাত্রকেই অভিভূত করে। তবুও জনাকেই এ কাব্যের সকল নারীর মধ্যে সর্বাধিক মুক্তমনা, সর্বাধিক স্বাধীনচেতা ও সর্বাধিক সাহসিকা বলে মনে করি না। স্বামীর বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ হলেও ত্রিকালগত স্বামী-সংস্কার তাঁর মজ্জায়, কুলনারী পরাধীনা—এই সংস্কারও তাঁর মধ্যে জগদ্দল, পত্রে এত কথার মধ্যেই তিনি লিখেছেন—

'গুরুজন তুমি,
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।
কুলনারী আমি, নাথ, বিধির বিধানে
পরাধীন।'

Scanned with CamScanner

—এই সংস্কার থেকে অনেকটাই মুক্ত জাহ্নবী, কিন্তু জাহ্নবীর প্রসঙ্গে সেটা বড় হয়ে ওঠে না তিনি দেবী বলে, মর্ত্যসংস্কার তাঁর মধ্যে কোনোদিন ক্রিয়াময় ছিল না বলে। কেকয়ীকেও বাহ্যত সর্বসংস্কারমুক্ত বলে মনে হলেও পত্রের উপান্তে যখন লিখতে দেখি—

'না থাকে যদি পাপ শরীরে;
পতি-পদ-গতা যদি পতিব্রতা দাসী;
বিচার করুন ধর্ম ধর্মরীতি-মতে।'

'পাপ', 'ধর্ম', 'পতিব্রতা', 'পদগতা' ইত্যাদি শব্দ কেকয়ীর সংস্কার-ফলক।

সর্বসংস্কারমুক্ত নারী একাব্যে বস্তুত একজনই—তারা। দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তিনি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে চন্দ্র বৃহস্পতির কাছে বিদ্যাধ্যয়ন করতে এসে গুরুপত্নী তারার রূপযৌবনে আকৃষ্ট হন এবং তারার প্রচণ্ড আপত্তি সত্ত্বেও তাঁকে উপগমন করেন। তখন ক্রুদ্ধ তারা তাঁকে অভিশাপ দেন যে তিনি যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হয়ে যাবেন।

মধুসূদন তারাকে সৃজন করেছেন পুরাণের ঠিক বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর তারা চন্দ্রকে যেদিন প্রথম দেখেছেন সেদিনই তাঁর প্রেমে পড়েছেন—

'যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ সলিলে।'

প্রথম দৃষ্টিতেই এ প্রেমসঞ্চারে তারা দ্রুত গিয়ে মুখ দেখলেন আয়নায়, বেণী বাঁধলেন, ফুলে ফুলে সাজালেন কুন্তলকুল, বনদেবীর কাছে নিয়ে অজস্র অলঙ্কারে সাজালেন তাঁর বরতণু।—মুখে তো বলতে পারলেন না তাঁর ভালোবাসা বলতে লাগলেন প্রাত্যহিক আচরণে। গুরুর প্রসাদ খান চন্দ্র, তারা তাই বহুখাদ্যসামগ্রী এনে গুরুর উচ্ছিষ্ট পাতে রেখে দিতেন, হরীতকী স্থলে তিনি রেখে দিতেন পান, যে কুশাসনে চন্দ্র বসবেন তার তলে রেখে দিতেন সুগন্ধী ফুল। চন্দ্রকে শুতে হত তৃণাসনে, তাই তারা ঘাসের উপর আগে থাকতে ফুল বিছিয়ে রাখতেন; গুরুর পূজার জন্য পুষ্পচয়নে যেতে হত চন্দ্রকে; তারা আঁধার-ভোরে উঠে ফুল তুলে রেখে দিতেন যাতে চন্দ্রের পুষ্পচয়নক্লেশ লাঘব হয়। প্রেমের এ সেবাময়ীভাষা তবু বুঝলেন না চন্দ্র, দিনের পর দিন পার হয়ে শেষ হল তাঁর বিদ্যাভ্যাসের কাল; তাঁর বিদায়ের প্রাক্কালে তারা আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না, দীর্ঘপত্রে চন্দ্রকে নিবেদন করলেন তাঁর হার্দ্য আকুতি।

সততই সহজ ছিল না এ-কাজ; মনে মনে ভাবা আর মুখে বা পত্রে তা উজার করে বলার মধ্যে পার্থক্য অনেক; চিরাচরিত সংস্কারের অনেক বাঁধন—অনেক সংকোচ-শরম কাটিয়েই তা সম্ভব; তারা তাঁর সে সংস্কার বা সংকোচ-শরমের কথাও গোপন করলেন না তাঁর পত্রে—

'গুরুপত্নী আমি
তোমার, পুরুষরত্ন; কিন্তু ভাগ্যদোষে
ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি!'

Scanned with CamScanner

স্মৃতির কাছে তিনি অব্যাহতি চাইলেন যেন তাঁর মনে না পড়ে অতীত; যেন ভুলে যান ভবিষ্যৎ-ভাবনা; যেন মনে না পড়ে তিনি মাতৃসমা গুরুপত্নী আর প্রিয় তাঁর পুত্রপ্রতিম। প্রিয়-আবাহনেও তিনি স্পষ্টতই বললেন—

"এস তবে, প্রাণসখে; দিনু জলাঞ্জলি
কুলমানে তব জন্যে,—ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয়ে!"

তথাকথিত সতীত্বধর্মের সংস্কারকে ত্যাগ করলেন তিনি মাতৃতুল্যা হয়ে পতিশিষ্যের কাছে প্রেমনিবেদনে যে লজ্জা আছে তাকে ত্যাগ করলেন এ অবৈধ প্রেমের পরিণতি সম্পর্কিত ভয়। অতঃপর জানালেন চন্দ্রকে প্রথম কবে তাঁর ভালো লাগল, সে ভালোলাগার প্রকাশই বা হল কেমন, জানালেন চন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনে তাঁর কি মুগ্ধতা জাগতো, কেমন করে শুনতেন সে কণ্ঠস্বর; জানালেন গুরুপত্নী বলে চন্দ্র যখন তাঁকে প্রণাম করতেন তখন কি ভাবতেন তিনি। চন্দ্রপত্নী তারাদের প্রতি—রোহিণীর শুভকান্তির প্রতি তাঁর অসুয়াবোধও তিনি গোপন করলেন না, গোপন করলেন না চন্দ্রপ্রেয়সী রূপে কথিত কুমুদ বা সরসীর প্রতি তাঁর বিদ্বেষও। সুগত বা অপগত দিনের যতকথা জানিয়ে তারা প্রার্থনা করলেন—

'তুষেছ গুরুর মনঃ সুদক্ষিণা-দানে;
গুরুপত্নী চাহে ভিক্ষা,—দেহ ভিক্ষা তারে।
দেহ ভিক্ষা ছায়ারূপে থাকি তব সাথে
দিবানিশি!'

স্মৃতি যে তাঁকে অব্যাহতি দেয়নি তা দেখছি এখানে 'গুরুপত্নী' শব্দের ব্যবহারে; আর এখানেই অনুভব করছি তারার সাহস ও সংস্কারমুক্ত মনের শক্তি, গুরুপত্নী হিসাবেই তিনি ভিক্ষা চাইছেন চন্দ্রের প্রেম। সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় তাঁর : 'নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।'—'কুলমান' বৃথা, সত্য শুধু প্রেম; প্রেমের জন্য সবকিছু ত্যাগ করতেই তিনি প্রস্তুত। এই সর্বসংস্কারমুক্ত মন, এই সাহস এবং এ প্রত্যয়দৃঢ়তাই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের মূর্ত রূপ। বীরাঙ্গনা কাব্যের আর কোনো নারীর মধ্যেই এমন সর্বসংস্কাররহিত্য, এমন সাহস ও এমন অনাপোস প্রত্যয় নেই।

কেউ কেউ বলেন, বৃদ্ধ স্বামীর কাছে আদর সোহাগে বঞ্চিত হয়েই নবযুবতী তারা চন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। একথা যাঁরা বলেন এ শুধু তাঁদেরই কল্পনা; এমন সহজ সমীকরণ মধুসূদন বা তাঁর তারা করেননি; লক্ষণীয় তারা স্বামী সম্পর্কে কোনো কথাই লেখেননি তাঁর পত্রে; চন্দ্রকে তিনি ভালোবেসেছেন এটাই তাঁর প্রথম ও শেষ কথা; কোনো অতৃপ্তি থেকে যদি তিনি ভালোবাসতেন সোমকে তবে সে ভালোবাসা সম্মানের হত না, হত না ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেরও উপযুক্ত প্রকাশ।

প্রচলিত সমস্ত সামাজিক সংস্কার যা কখনো ধর্মের নামে, কখনো প্রথার নামে, কখনো অবশ্যমান্য কুলাচারের নামে যুগ যুগ ধরে নারীকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অনমনীয় আত্মপ্রত্যয়ে সে-সবের উপরে এসে যে নারী নিজের আকাঙ্ক্ষার কথাটি অসংকোচে উচ্চারণ করতে পারেন তিনিই বীরাঙ্গনা। মধুসূদনের এই বীরাঙ্গনা-ভাবনার শিল্পিত শ্রেষ্ঠরূপ তারা।

Scanned with CamScanner

যে পত্রের আলম্ব এ হেন চরিত্র, তা শ্রেষ্ঠের সম্মান নিঃশেষে দাবি করে তবু সুলিখিত হয়েই। বস্তুত পত্রিকা-কাব্য হিসাবেও এ অত্যুত্তম। লক্ষণীয়, পত্রিকাটি শুরুই হয়েছে প্রথা ভেঙে; সম্বোধন আছে, কিন্তু ভারী নাটকীয় ভাবে এর সূচনা। পত্র হিসাবে এ অপরের উদ্দেশ্যে মনের কথারই লিপিচারিতা, তবু মাঝে মাঝেই লেখিকা হয়ে পড়েছেন আত্মমগ্না। এতে তাঁর আত্মোন্মোচন যেমন জড়িমা ও স্পষ্টোচ্চারের মধ্যে দিয়ে পূর্ণতার পথ খুঁজেছে, তেমনি পত্রটিও কাব্যে-নাটকে মিশে ছুঁতে পেরেছে পরমোৎকর্ষের মাত্রা।

একই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা পুরো এ পত্রিকা, তবু শব্দক্ষেপণের কুশলী নিয়ন্ত্রণে এর উচ্চারণ হয়েছে বৈচিত্র্যময়।

'এস, হে, তারার বাঞ্ছা! পোড়ে বিরহিনী
পোড়ে যথা বনস্থলী ঘোর দাবানলে!'

সরল আকুতিময় এ উচ্চারণের পাশাপাশি স্মরণ্য—

'কুল-বিহঙ্গিনী
উড়িল পবন-পথে, ধর আসি তারে,
তারানাথ!—তারানাথ? কে তোমারে দিল
এ নাম, হে গুণনিধি, কহ তা তারারে!'

বিস্ময়ের উচ্চারণমাখা এ উচ্চারণ নাটকীয় চমকে দীপ্ত। তবে অবরোধ-ভাঙা প্রেমিকার প্রকাশ-বেদনাই এ পত্রের উচ্চারণকে বেঁধে দিয়েছে নম্র মাত্রায়। আকুতিতে ভরা শব্দে-শব্দে রোম্যান্টিকতারই এ এক নবতন আলিম্পনা। অমিত্রাক্ষরে এ-হেন আলিম্পনা মাইকেল আগে রচনা করেননি তা বলা যাবে না, তবে অমিত্রাক্ষরের এ সাহসী পরীক্ষা, এবং সে পরীক্ষায় কবি-লক্ষ্য সফল।

যেমন বিষয়, তেমনি তার বিন্যাস শিল্প—দুই-ই যেন পরস্পরের মতো অভিন্ন। শিল্প সাধনার চিরকাঙ্ক্ষেয় এই অভিন্নত্ব লাভ করেই তারার পত্র 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র শ্রেষ্ঠপত্রের মর্যাদাধিকারী।

Scanned with CamScanner

বীরাঙ্গনা কাব্য : কাব্যপরিচয়

'মেঘনাদবধ' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড (শেষ চারটি সর্গ) প্রকাশিত হওয়ার আগেই মধুসূদন তাঁর সে-সময়ের সবচেয়ে প্রিয়বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন—

'I suppose I must bid adieu to Heroic Poetry after Meghnad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way.'[১]

—এই যে তিনি আর বীররসের মহাকাব্য লিখতে চাইছেন না, মগ্ন হতে চাইছেন রোম্যান্টিক ও লিরিক কাব্য রচনায়, এই চাওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বীরাঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনা রচনার প্রেরণা-ভ্রূণ। কিন্তু ২৯ আগষ্ট, ১৮৬১ রাজনারায়ণ বসুকেই লেখা অন্য একটি চিঠিতে দেখা যাচ্ছে ব্রজাঙ্গনায় রাধার প্রসঙ্গ থাকলেও বীরাঙ্গনায় কোনো প্রসঙ্গ নেই এবং পরবর্তী কাব্য বিষয়ও তিনি নির্বাচন করতে পারেননি।[২]

এর পরবর্তী একটি তারিখহীন চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন—"...within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called 'বীরাঙ্গনা' i.e. Heroic Epistles from the most noted women to their lovers or lords.'[৩]

এই চিঠিতে তিনি আরো জানাচ্ছেন যে কাব্যটি একুশটি সর্গে লিখবেন মনে করেও তা করতে পারলেন না, এগারোটি সর্গ লিখেই ছাপতে পাঠিয়েছেন, কারণ সময় নাই। কেন সময় নাই, তাও জানিয়েছেন। খিদিরপুরের যে পৈত্রিক গৃহে তাঁর আইনী অধিকার অল্প কিছুদিন আগেই আদালতের নির্দেশ-বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে সেই বাড়ি তিনি মর্টগেজ রাখার চেষ্টা করছেন; কুড়ি হাজার টাকা তাঁর দরকার; এই টাকা নিয়ে তিনি বিলাত যাবেন ব্যারিষ্টারি পড়তে। তাঁর বিশ্বাস টাকা জোগার হবেই এবং সেইজন্য মশগুল আছেন তিনি তাঁর আবাল্য পোষিত স্বপ্নপূরণ তথা বিলাত যাত্রার উদ্যোগে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বন্ধুকে তিনি লিখছেন—No more Modhu the 'কবি' old fellow, but Michael M. S. Dutt Esquire of the Inner Temple Barrister-at-Law!! Ha!! Ha!!'—এই স্বপ্নপূরণে উদ্যোগী ও ব্যস্ত হয়েই তিনি লিখেছিলেন, 'I suppose, my poetical career is drawing to a close.', কোনো হতাশা বা নির্বেদ থেকে নয়।

মধুসূদন বিলাত গিয়েছিলেন ১৮৬২-র জুলাই মাসে। সেদিক থেকে অনুমান করা যায় এই চিঠিটি ১৮৬১-র শেষ অথবা ১৮৬২-র একেবারে প্রথম দিকে লেখা। সেক্ষেত্রে যদি মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ('within the last few weeks') এ কাব্যের এগারোটি পত্র লেখা হয়ে গিয়ে থাকে, তবে ধরে নেওয়া যায় ১৮৬১-র শেষ দিকেই—বড় জোর ১৮৬২-র জানুয়ারীর মধ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন 'বীরাঙ্গনা' কাব্য। ১৬ ফাল্গুন, ১২৬৮ (১৮৬২)-তে এ কাব্য প্রকাশিত হয়।

---

১. মধুসূদন রচনাবলী/সাহিত্য সংসদ/১৯৮৫/পৃ. ৫৫৯ (পত্র সং. ৬৭)

২. ঐ/পৃ. ৫৬৪-৫৬৫ (পত্রসংখ্যা ৭৩)

৩. ঐ/পৃ. ৫৬৫ (পত্রসংখ্যা ৭৪)

Scanned with CamScanner

প্রথম প্রকাশের সময় এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৭০, আখ্যাপত্রে লেখা হয়েছিল—

"আখ্যাপত্র

বীরাঙ্গনা কাব্য। শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত

লেখ্যপ্রস্থাপনৈঃ—

নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তি রিষ্যতে।।'

সাহিত্যদর্পণং

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ১৮২ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যানহোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত।

সন ১২৬৮ সাল।"

'মঙ্গলাচরণ' প্রসঙ্গে লেখা হয়েছিল—

মঙ্গলাচরণ

বঙ্গকুলচূড়া

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের

চিরস্মরণীয় নাম

এই অভিনব কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে

স্থাপিত করিয়া,

কাব্যকার ইহা

উক্ত মহানুভবের নিকট

যথোচিত সম্মানের সহিত

উৎসর্গ করিল।

ইতি।

১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাল্গুন।

বিদ্যাসাগরকে এ গ্রন্থ উৎসর্গ করার প্রসঙ্গটি অন্য একটি চিঠিতেও উল্লেখ করেছেন মধুসূদন (৭৫ সংখ্যক চিঠি, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত মধুসূদন রচনাবলী); লিখেছেন—

"I have dedicated the work to our good friend the Vidyasagar. He is a splendid fellow ! I assure you. I look upon him in many respects as the first man among us."

অন্য বন্ধুকে লেখা ব্যক্তিগত চিঠিতে এ হেন মন্তব্য প্রমাণ করে মঙ্গলাচরণে বিদ্যাসাগর-প্রশস্তি মধুসূদনের সত্যশ্রদ্ধারই প্রতিফলন।

বীরাঙ্গনার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১২৭৩-এ (পৃ. ৭৬) এবং ১৮৬৯-এর ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল এর তৃতীয় সংস্করণ। তৃতীয় সংস্করণ থেকে আখ্যাপত্রে সাহিত্যদর্পণের উদ্ধৃতিটি বাদ দেওয়া হয়েছিল।—১৮৭৩-এ কবির মৃত্যুর আগে এ গ্রন্থের আর কোনো সংস্করণ হয়নি।

অন্যান্য কাব্য বা নাটকের ক্ষেত্রে যেমন, তার বিপরীতভাবেই এ গ্রন্থ সম্পর্কে মধুসূদন অপেক্ষাকৃত মিতবাক; মাত্র পূর্বোল্লিখিত দুটি চিঠিতেই (৭৪ এবং ৭৫ সংখ্যক) এ গ্রন্থের কথা তাঁকে লিখতে দেখা যাচ্ছে, তাতেও তাঁর কোনো মূল্যায়ন, আশা বা প্রত্যয়ের কথা নেই, হয়তো ওই পূর্বোল্লিখিত কারণেই এ কাব্য নিয়ে মুখর হওয়ার অবকাশ তিনি পাননি, কিন্তু দেড়শো বছর ধরে এর অনিত্য আবেদনই চিনিয়ে দেয় এর কালজয়ী মহিমা।

সে মহিমার উৎস ও স্বরূপ সম্ভাব্য সকল দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝে নেওয়াই আমাদের কৃত্য।

Scanned with CamScanner

পত্রকাব্য হিসাবে বীরাঙ্গনা কাব্য ঃ নাস্তিপূর্বপরোবা

পত্রাকারে লেখা কাব্য 'বীরাঙ্গনা'। পত্রলেখা ভারতীয় সাহিত্যে অভূতপূর্ব নয়; মহাভারতে দময়ন্তী পত্র লিখে নলের কাছে প্রেরণ করেছিলেন হংসদূতের মাধ্যমে, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এ বিরহবিধুরা শকুন্তলা পত্র লিখেছিলেন দুষ্মন্তের উদ্দেশ্যে, ভাগবতে রুক্মিণী পত্র লিখে শ্রীকৃষ্ণের কাছে প্রেরণ করেছিলেন এক ব্রাহ্মণের মাধ্যমে। কিন্তু এগুলি সবই কাব্য-নাটকের এক-একটি ক্ষুদ্র অংশ, উপাখ্যানের অন্তর্গত এক-একটি ঘটনা, পত্রেই সমগ্র বিষয়ের উপস্থাপনা নয়। পক্ষান্তরে 'বীরাঙ্গনা'র প্রতিটি পত্রই সংশ্লিষ্ট সম্পূর্ণ বিষয়ের শিল্পিত আধার। সুতরাং ভারতীয় সাহিত্য-ঐতিহ্যে এ অভিনব।

আবার, পরবর্তী বাংলা সাহিত্যেও নেই বীরাঙ্গনার দোসর। নাটকীয় একোক্তি জাতীয় কবিতা আছে, রবীন্দ্রনাথের 'সাধারণ মেয়ে', সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'জেলখানার চিঠি' সুকান্তের 'প্রিয়তমাসু' ইত্যাদির মতো পত্রকবিতা আছে, কিন্তু সমন্বিত বিষয়ে একাধিক পত্রকবিতায় গ্রথিত পত্রকাব্য নেই। আগে নেই, পরেও নেই 'বীরাঙ্গনা'র সমতুল কাব্য, এইজন্যই সে 'নাস্তিপূর্বপরোবা', অনন্য সে, নির্বিকল্প।

তবে নির্বিকল্প এ বাংলা কাব্যপরিকল্পনা মধুসূদনের স্বোদ্ভাবিত নয়, এর আদর্শ আছে ইতালীয় সাহিত্যে, ছেলেবেলা থেকেই যার মুগ্ধ পাঠক ছিলেন বহুভাষাবিদ কবি। ভার্জিলের কাব্যপাঠের পূর্বে, বিদ্যালয় জীবনেই তিনি পাঠ করেছিলেন খ্রীষ্টপূর্ব তেতাল্লিশে গৃহীতজন্ম রোমক কবি পাবলিয়াস ওভেদিয়াস নাসো-র মেটামরফোসিস (Metamorphoses): এঁরই 'হিরোইড্স' (Heroides or Epistles of the Heroines') কাব্যপাঠে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন অনুরূপ কাব্যরচনায়। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' বস্তুত এই অনুপ্রেরণারই ফলীভূত কাব্যরূপ।

ওভিদের কাব্যটিও ছিল পত্রে লেখা কাব্য, পত্রগুলি ছিল কবির নয়, এক-একজন নায়িকা বা নায়কের বয়ানে লেখা এবং পত্রসংখ্যা ছিল একুশ, যার প্রথম পনেরোটি নিজ নিজ প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে নায়িকাদের লেখা; বাকি ছয়টি তিন জোড়া প্রেমিকা-প্রেমিকের পত্র-বিনিময়। মধুসূদন তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের পরিকল্পনা করেছিলেন প্রায় একইভাবে। প্রথম খণ্ডে তিনি সমায়োজিত করেছিলেন এগারোজন নায়িকার বয়ানে লেখা পত্র, নায়িকারা প্রত্যেকেই ওভিদের মতোই পৌরাণিক কায়ায় আধুনিকা; দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনাও হয়তো তিনি করেছিলেন ওভেদীয় পন্থায় অর্থাৎ পত্র-বিনিময়ের রীতিতে। কিন্তু বিলাত যাত্রার ব্যস্ততায় পঞ্চনায়িকার পাঁচটি পত্রের কয়েক পংক্তি করে রচনার পর সেগুলো আর শেষ করতে পারেননি, হাত দিতেই পারেননি পঞ্চ প্রিয়তমের উত্তর লেখায়। তাতে অবশ্য 'বীরাঙ্গনা কাব্যে' কোনো ত্রুটিই বর্তায়নি; এগারোটি পত্রেই তার সম্পূর্ণ অবয়ব কল্পনা করতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না। বস্তুত ওভিদের কাব্য-পরিকাঠামোর সঙ্গে তাকে সম্পূর্ণ মেলারও দরকার নেই। 'হিরোইড্স' প্রসঙ্গ স্মরণীয় মূলত এই জন্যই যে এ-কাব্যই মধুসূদনের মনে এনে দিয়েছিল পত্রকাব্য লেখার পরিকল্পনা, আর দিয়েছিল রীতি ও বিষয়বস্তুর সংকেত।

'হিরোইডস' ছিল 'এপিস্লস্', বীরাঙ্গনা কাব্যও তাই। পত্রকাব্য। কাকে বলব পত্রকাব্য? বলব সেই কাব্যকে পত্ররচনারীতি যার আঙ্গিক। স্বভাবতই এ পরিচয় একটি কাব্যের

Scanned with CamScanner

আঙ্গিকগত পরিচয়, তার স্বরূপগত পরিচয় নয়। স্বরূপ বিচারে ওভিদের 'হিরোইডস' 'অবলেজকটিভ লিরিক', বীরাঙ্গনা কাব্যও তাই। অতএব, পত্রকাব্য হিসাবে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'-র সার্থকতা নিরূপণ করতে চাওয়া, আসলে তার প্রকরণ বা রীতিগত পরিচয়েরই অন্বেষা।

পত্ররচনারীতিতে বজায় থাকে এই বৈশিষ্ট্যগুলি—

ক. সম্বোধন, অর্থাৎ কার উদ্দেশ্যে লেখা তার স্পষ্ট উল্লেখ,

খ. উদ্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি সম্ভাষণ; কখনো কখনো এর অনুপস্থিতি ঘটিয়ে সরাসরি বিষয়ের উপস্থাপনা করে পত্রলেখক বা লেখিকার উত্তেজনা, উদ্বেগও প্রকাশ করা হয়, সেক্ষেত্রে পত্রে সংব্যাপ্ত হয় নাটকীয়তা,

গ. কেন, কোন্ অবস্থায় পত্রলেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তার উল্লেখ বা ব্যাখ্যা,

ঘ. লেখক বা লেখিকার বলার কথা, যা আত্মিক সংকট-সমস্যা বা অনুভূতি হতে পারে অথবা হতে পারে পরিস্থিতিগত সংকট-সমস্যা বা আবেদন,

এবং ঙ. উদ্ভূত পরিস্থিতিতে লেখক বা লেখিকার আকাঙ্ক্ষা, কামনা বা অভিলাষ।

পৌরাণিক যুগপটভূমিতে লেখা পত্রে আরেকটি বৈশিষ্ট্যও অনিবার্য : সে পত্র কার মাধ্যমে কিভাবে প্রাপকের কাছে প্রেরণ করা হবে, কিভাবে হস্তগত করা হবে তার। ডাকব্যবস্থা যখন নেই তখন এ বিষয়টি গুরুত্ব পাওয়া অনিবার্য এইজন্য যে পত্রলেখার উদ্দেশ্যই তা প্রাপকের কাছে প্রেরণ। এ বিষয়টি যদি সুস্পষ্ট না হয় তবে পত্রের বিষয়বস্তু অনেকটা ডায়েরি বা আত্মকথা লেখার সমধর্মী হয়ে উঠবে।

উপরিলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির নিরিখে বিচার করা যেতে পারে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা কাব্য' পত্রকাব্য হিসাবে কতখানি সার্থক।

'বীরাঙ্গনা' কাব্যের প্রতিটি সর্গ তথা প্রতিটি পত্রের যে নামকরণ করা হয়েছে—যেমন 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'সোমের প্রতি তারা', 'দ্বারকনাথের প্রতি রুক্মিণী' ইত্যাদি, তার থেকেই স্পষ্ট হয়ে যায় পত্রটি কার উদ্দেশে কার লেখা। কিন্তু সেটাই এ প্রসঙ্গে শেষ কথা নয়, পত্রমধ্যেও প্রাপক এবং লেখিকার স্পষ্টোল্লেখ রয়েছে অধিকাংশ পত্রেই। যেমন শকুন্তলা তাঁর পত্রের শুরুতেই লিখেছেন :

'বন-নিবাসিনী দাসী নমে রাজপদে
রাজেন্দ্র!'

'বননিবাসিনী দাসী' শকুন্তলা এ পত্রের লেখিকা, 'রাজেন্দ্র' দুষ্মন্ত এর প্রাপক। প্রাপক ও প্রেরিকার পরিচয় ব্যক্ত-করণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপক তথা স্বামী সম্ভাষণের কাজটিও শকুন্তলা সেরে নিয়েছেন পত্রের শুরুতেই। তারা তাঁর পত্র শুরু করেছেন এইভাবে :

'কি বলিয়া সম্বোধিবে, হে সুধাংশুনিধি,
তোমারে অভাগী তারা?'

স্বতোস্পষ্ট যে, 'সুধাংশুনিধি' এ পত্রের প্রাপক এবং তারা এর লেখিকা; 'ইচ্ছা করে দাসী হয়ে সেবি পা দুখানি'—এই তার লজ্জাকুণ্ঠ প্রিয়-সম্ভাষণ। রুক্মিণী দ্বারকানাথকে 'ঋষিকেশ তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন এবং নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'রুক্মিণী,—ভীষ্মক-

Scanned with CamScanner

পুত্রী' বলে; তাঁর সম্ভাষণ 'নমি ও রাজীব-পদে'। পত্রের প্রথম পাঁচ পংক্তির মধ্যেই পত্রকাব্যের প্রথম দুটি শর্ত পালিত হতে দেখছি। একইভাবে কেকয়ী, দ্রৌপদী, ভানুমতী, জাহ্নবী, উর্বশী প্রভৃতির পত্রেও রয়েছে সম্বোধন, রয়েছে সম্ভাষণ, কোথাও তা সরাসরি কোথাও কিঞ্চিৎ ব্যঞ্জনার্থে, আত্মপরিচয় অবশ্য সকলেই পত্রের পুরোভাগে দেননি, কারণ সেক্ষেত্রে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা তর্কিত হতে পারত; দ্রৌপদী যদি পত্রের শুরুতেই নিজের পরিচয় দিতে যেতেন তবে অর্জুনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিস্মরণ-সম্ভব প্রতিপন্ন হত, সেক্ষেত্রে তাঁর অভিমান দাঁড়ানোর জায়গা পেত না।

লক্ষণীয় যে, শূর্পণখার পত্রে স্পষ্টত সম্বোধন নেই, নেই কারণ এ পত্র প্রেমের প্রস্তাব, একইভাবে উর্বশীও তাঁর প্রেম ব্যক্ত করতে কৌশলপরায়ণতার সাহায্য নিয়েছেন, দুঃশলা প্রিয় সম্বোধন করেননি অন্য কারণে, স্বামীর আসন্ন নিধনের উদ্বিগ্নতায় তিনি দিশেহারা, তাঁর পত্র শুরুই হয়েছে সেই উদ্বিগ্নতা দিয়ে, ঠিক যেমন চরম উত্তেজনায় শুরু হয়েছে জনার পত্র এবং সেজন্যে পত্রারম্ভেই তিনি প্রবেশ করেছেন বিষয়ের ভিতর, পরে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে সম্বোধন, সম্ভাষণ। সম্বোধন, বা সম্ভাষণের পূর্বে সরাসরি বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করায় জনা ও দুঃশলার পত্রের শুরুতেই সম্ভাবিত হয়েছে নাটকীয় অভিক্ষেপ। এ নাটকীয় অভিক্ষেপ কেকয়ীর পত্রেও আছে—

'একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে
রঘুরাজ?'

কেন, কোন্ অবস্থায় লেখিকা বীরাঙ্গনারা তাঁদের পত্রগুলি রচনা করেছেন, তার নির্দেশ মধুসূদন নিজেই প্রতিটি সর্গ তথা পত্রের ভূমিকায় জানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু তার চেয়ে যা গুরুত্বপূর্ণ, যা পত্রগুলিকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরি, তা হল পত্রমধ্যে সেই অবস্থার বিবরণ। শকুন্তলা লিখেছেন—

'যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?'

দুষ্মন্ত ভুলে গেছেন, অথচ অভাগিনী শকুন্তলা অহরহ নিবিষ্ট তাঁরই স্মৃতি ও প্রতিশ্রুতিতে। প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি দুষ্মন্তকে মনে করিয়ে দিতেই শকুন্তলার পত্রলেখা।—গুরুপত্নী তারা গোপনে ভালোবেসেছেন সোমকে, মুখ ফুটে তা বলতে পারেননি, তাই বাধ্য হয়েছেন লেখনীর আশ্রয় নিতে; লিখেছেন—

'কে পারে লুকাতে কবে জ্বলন্ত পাবকে?
এস তবে, প্রাণসখে! তারানাথ তুমি;
জুড়াও তারার জ্বালা!'

রুক্মিণীর সমস্যা হল :

'চেদীশ্বর নরপাল শিশুপাল নামে,
(শুনি জনরব) নাকি আসিছেন হেথা
বরবেশে বরিবারে, হায় অভাগীরে।'

কিন্তু তাঁর মনোনীত পতি দ্বারকানাথ; তাই দ্বারকানাথকেই এ মহাবিপদে পত্র লিখেছেন তিনি।—দুর্যোধনের ভগ্নী দুঃশলা তার স্বামীকে পত্র লিখেছেন সঞ্জয়ের মুখে জয়দ্রথ-বধে অর্জুনের ভয়ঙ্কর শপথ শুনে ভীত হয়ে; জাহ্নবী পত্র লিখেছেন গঙ্গা-বিরহে উদাসীন

Scanned with CamScanner

রাজা শান্তনুকে পুত্র দেবব্রতকে ফেরৎ দিতে গিয়ে। মাহিষ্মতীর রাণী রাজা নীলধ্বজকে পত্র লিখেছেন পুত্রাহ অর্জুনকে রণক্ষেত্রে হত্যার উদ্যোগ না-নিয়ে তাঁকে রাজপুরীতে সম্বর্ধনা দওয়ার রাজোদ্যোগ দেখে।

—অকারণে লেখা নয় কোনো পত্রই, যা কারণ তা নাটকীয়ভাবে অথবা সরলভূমিকায় উপস্থাপিত হয়েছে প্রতিটি পত্রেই।

যে যুগপটভূমিতে দাঁড়িয়ে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'-র নায়িকারা তাঁদের পত্রগুলি রচনা করেছিলেন তখন কোনো ডাকব্যবস্থা ছিল না। সতেতই কবিকে কল্পনা করে নিতে হয়েছে এ পত্র কি উপায়ে প্রেরিত হল প্রাপকের কাছে। কোনো কোনো পত্রে নায়িকারা তার উল্লেখও করেছেন। যেমন—শকুন্তলা তাঁর পত্র প্রেরণ করেছিলেন 'বনচর চর' অর্থাৎ হরিণকে দিয়ে, দ্রৌপদী অর্জুনকে তাঁর পত্র প্রেরণ করেছিলেন এক ঋষিপুত্রের মাধ্যমে, উর্বশী পুরুরবার কাছে তাঁর পত্র পাঠিয়েছিলেন সখী চিত্রলেখার সাহায্যে, শূর্পণখা পত্র পাঠাননি, বনভূমির যে অংশে লক্ষ্মণ বিচরণ করতেন সেখানেই রেখে এসেছিলেন। অন্যান্য সকলে কিভাবে আপনাপন প্রিয়াস্পদের কাছে পত্র প্রেরণ করেছিলেন, কবি অবশ্য তাঁর বর্ণনা দেননি। তবে যেমন কল্পনা করে নেওয়া যায় জাহ্নবী পত্রসহ পুত্রকে শান্তনুর কাছে প্রেরণ করেন, তেমনি কল্পনা করা যায় তারা হয়ত কোনো আশ্রম-বালকের মাধ্যমে এবং অপরাপরেরা রাজপরিবারের অঙ্গনা হিসাবে বিশ্বস্ত দাসী, পরিচারিকা বা পরিচারকের হাতে নিজ নিজ পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

কোনো কোনো পত্রে লেখিকা উল্লেখ করেছেন কি দিয়ে লিখেছেন তাঁর পত্রখানি। যেমন, কেকয়ী জানিয়েছেন—'চিরি বক্ষঃ মনোদুঃখে লিখিনু শোণিতে/লেখন'; তারা জানিয়েছেন—'লয়ে ফুলবৃন্ত, কান্ত, নয়ন-কাজলে/লিখিনু'; শকুন্তলা জানিয়েছেন—'পদ্মপর্ণ নিয়া/কত যে কি লিখি নিত্য'...। অবশ্যই সকলের পত্রে এ তথ্য নেই। তেমনি সকলের পত্রে না থাকলেও কারো কারো পত্রে বর্ণিত হয়েছে কোথায় বসে তাঁরা পত্ররচনা করেছেন। যেমন, দ্রৌপদী তাঁর পত্র লিখেছেন তরুমূলে বসে, তারা জানিয়েছেন—'লিখিনু লেখন বসি একাকিনী বনে'. উর্বশী জানিয়েছেন—'লিখিনু এ লিপি বসি মন্দাকিনী-তীরে/নন্দনে'। কোনো কোনো পত্রে আছে পত্রলেখার নানা প্রসঙ্গ। যেমন—

১. 'পড়িও এ লিপিখানি, এ মিনতি করি পদে'!

(লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা)

২. "...এত দূর লিখি
লেখন, সখীর মুখে শুনিনু হরষে...'

(ঐ)

৩. 'ক্ষম অশ্রু-চিহ্ন পত্রে; আনন্দে বহিছে
অশ্রুধারা!'

(ঐ)

৪. 'এতদূর লিখি কালি, ফেলাইনু দূরে
লেখনী।'

(অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী)

৫. 'লিখিলে উত্তর তিনি আনিবেন হেথা।'

(ঐ)

৬. 'বাড়িতে লাগিল লিপি; তবুও কহিব...'

(দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী)

Scanned with CamScanner

পত্রমধ্যে এ জাতীয় উক্তি পত্রলেখার ভাবচ্ছবিকে জীবন্ত করে তুলেছে, আর প্রমাণ করে দিয়েছে কবির অবজেকটিভিজমের চর্চা কত নিখুঁত। কিন্তু লক্ষণীয় যেসব নায়িকা প্রচণ্ড উদ্বেগ, ক্ষোভ, ধিক্কার বা প্রতিবাদে উত্তুঙ্গ হয়ে তাঁদের পত্রগুলি রচনা করেছেন সেসব পত্রে সতত এজাতীয় উক্তি নেই, থাকলে তাতে তাঁদের মানসিক উদ্বেগের তীব্রতা এবং ব্যক্তিত্বের গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হত। কেকয়ী বা জনার পত্রে এ জন্যই এ-জাতীয় উক্তি থাকা অপ্রত্যাশিত, যেমন অপ্রত্যাশিত জাহ্নবীর পত্রেও। তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে প্রত্যেক পত্রলেখিকার পূর্ণাবয়ব ব্যক্তিত্ব মাথায় রেখেই মধুসূদন তাঁর পত্রিকার ভাষ্যরচনা করেছেন।

প্রতিটি পত্রের বিষয় নির্ধারণেও মধুসূদনের কৃতিত্ব অপরিসীম। লক্ষণীয় প্রত্যেক নায়িকাই পত্র রচনা করেছেন নিজ নিজ জীবনের চরম নাটকীয় মুহূর্তে, আর এ নাটকীয় মুহূর্ত উৎসারিত হয়ে এসেছে বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁদের আবেগ, প্রত্যাশা বা মননের সংঘাতের ফলে। পরিস্থিতিটা ব্যক্ত করে নায়িকাদের জীবনবৃত্ত, আর তাঁদের আবেগ, প্রত্যাশা বা মনন সেই জীবনবৃত্তে বিকশিত করে তোলে তাঁদের নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব। অবশ্যই সবার ব্যক্তিত্ব সমান নয়, অনেকেই নন পৌরাণিক উৎসের অনুরূপ, অনেকের পৌরাণিক ইতিবৃত্তকে পাল্টেও নিয়েছেন মধুসূদন। পৌরাণিক বৃত্তে জানা যায় সোম বা চন্দ্রই গুরুপত্নী তারার প্রতি প্রলুব্ধ হয়ে তাঁর উপর উপগত হন, মধুসূদন দেখিয়েছেন ঠিক তার উল্টো; বাল্মীকি বর্ণিত বিকটা সূর্পণখাকে তো কবি স্পষ্টতই ভুলে যেতে বলেছেন, ভানুমতী, দুঃশলা, জাহ্নবী প্রভৃতির ঘটনাগত পৌরাণিক পরিস্থিতি অবিকৃত থাকলেও তাঁদের প্রত্যাশা, মনন ও সিদ্ধান্তের স্বতন্ত্র অভিক্ষেপে চরিত্রগুলির স্বরূপ ও উপস্থাপ্য বিষয় হয়ে উঠেছে অভিনব।

শকুন্তলাকে যে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছিলেন রাজা দুষ্মন্ত, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও সে আশ্বাস পূর্ণ না হওয়ায় উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায়, পতিবক্ষসংলগ্না হওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় আর সখীদের গঞ্জনা থেকে স্বামীকে রক্ষা করতে শকুন্তলা স্বামীকে তাঁর অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে লিখেছেন পত্র। কেকয়ী চেয়েছেন স্বামীর পূর্ব অঙ্গীকার মতো বর—তাঁর ছেলে ভরত যুবরাজ হবে।—দেবগুরু বৃহস্পতির পত্নী তারা ভালোবেসে ফেলেছেন স্বামী-শিষ্য চন্দ্রকে। শিক্ষান্তে চন্দ্রের বিদায়কালে তারা আর তাঁর মনোবেদনা চেপে রাখতে পারেননি, পত্রে নিবেদন করেছেন তাঁর প্রেম।—দ্বারকানাথ কৃষ্ণকে ভীষ্মক-পুত্রী রুক্মিণীও পত্র লিখে প্রেম নিবেদন করেছেন দারুণ বিপত্তিকালে। ভাই রুক্ম তাঁর বিয়ে ঠিক করেছেন চেদীশ্বর শিশুপালের সঙ্গে, অথচ রুক্মিণী মনে মনে দীর্ঘকাল থেকে ভালোবাসেন দ্বারকানাথকে। পত্রে তিনি আবেদন করেছেন দ্বারকানাথ এসে তাঁকে উদ্ধার করুন।—বনচারী লক্ষ্মণকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে সূর্পণখা, আর কোনোভাবে নিজের মনোভাব তাঁকে জানাতে না পেরে পত্র লিখে রেখে এসেছেন যেখানে লক্ষ্মণের দৃষ্টি পড়বে।—অর্জুনকেই অন্য স্বামীদের মধ্যে বেশি ভালোবাসতেন দ্রৌপদী। অস্ত্রশিক্ষার জন্য অর্জুন স্বর্গে গেলে তাঁর বিরহে কাতর হয়ে তাঁকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসার জন্য পত্র লিখেছেন তিনি।—পুত্রহন্তা অর্জুনের প্রতিশোধ না নিয়ে রাজপুরীতে তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করার রাজোদ্যোগে ক্ষুব্ধ জনা চরমপত্র লিখেছেন তাঁর স্বামীকে। এইভাবে প্রতিটি পত্রেই লক্ষ করা যাবে বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনো

Scanned with CamScanner

পত্রই লঘু বিষয় নিয়ে রচিত নয়। সততই প্রত্যেক পত্রে লেখিকার বিশিষ্ট কামনা বা প্রার্থনাও ব্যক্ত হয়েছে অতি স্পষ্ট ও সরলভাবে। যেমন—দুঃশলা চান জয়দ্রথ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসুন, গোপনে চলে যান তাঁর সঙ্গে; ভানুমতী চান দুর্যোধন পাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে তাঁদের পাঁচ ভাইকে পাঁচখানি গ্রাম দিয়ে সন্ধিস্থাপন করুন, জাহ্নবী চান শান্তনু বিরহিত দিনাতিপাতের অবসান ঘটিয়ে পুত্র দেবব্রতকে নিয়ে ফিরে যান রাজকার্যে, স্ত্রীরূপে তাঁকে আর যেন কোনোদিন না ভাবেন, উর্বশী চান পুরুরবার প্রেম।

পত্রে ফুটে ওঠে লেখক বা লেখিকার ব্যক্তিত্ব। বীরাঙ্গনা কাব্যের পত্রগুলিতে লেখিকাদের জীবনবৃত্তাভাস থাকায় এ সুযোগ আরও বেশি ছিল। মধুসূদন সে সুযোগ কাজে লাগাতে পেরেছেন অতীব কৃতিত্বে। তাঁর শকুন্তলা হয়ে উঠেছে শান্ত প্রকৃতির নারী, স্বামীর অবজ্ঞা যাকে অধীর করেছে, তবু স্বামীর প্রতি কারো কটূবাক্য যার সহনাতীত, আকুলিত প্রার্থনায় সে স্বামীর চরণে স্থান পেতে চায়।—সতী-সংস্কারে আত্মগ্লানি জাগলেও তাঁর তারা ব্যক্তিত্বের সেই দৃঢ়তায় আধুনিক যা তাঁকে সংস্কার ভাঙা প্রেমের পথে অগ্রণী করেছে।—রুক্মিণী নিতান্তই দয়িত-নির্ভর; তবে কেকয়ীর ব্যক্তিত্ব বিদ্রোহে উত্তুঙ্গ, অনাচারী স্বামীর বিরুদ্ধে অনাপোষ সংগ্রামে তিনি উদ্বুদ্ধা। সূর্পণখা নবজন্ম পেয়েছে মধুসূদনে, যদিও তার ব্যক্তিত্বে প্রেমমদির আকাঙ্ক্ষা ছাড়া অন্য কোনো মাত্রা ফোটেনি।—শাণিত ব্যঙ্গ আর সুদৃঢ় প্রেম, ভাগ্যের প্রতি বিদ্রোহ আর পাণ্ডব ঘরণীর দায়িত্ব-কর্তব্যবোধ—এই নিয়ে গড়ে উঠেছে দ্রৌপদীর বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব। ভানুমতীর ব্যক্তিত্ব শান্তশ্রীময়; প্রমত্ত স্বামীকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর লাভালাভ ও কর্তব্য-অকর্তব্য। বিচক্ষণতা, ধৈর্য, সমদর্শিতা ন্যায়পরায়ণতা ও স্বামীপ্রেমে তাঁর ব্যক্তিত্বও বহুমাত্রিক। দুঃশলা কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক; স্বামীর বিপদ দেখে তাঁকে পালিয়ে আসার অনুরোধ করাই তাঁর পত্রলেখার হেতু। জাহ্নবীতে আবার নারীর ঝলসিত ব্যক্তিত্ব; শান্তনুকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে তিনি দাঁড়িয়েছেন শকুন্তলার বিপরীতে। উর্বশীর ব্যক্তিত্ব একমাত্রিক, প্রেমাবেদনে উন্মুখরসে।—আর্ত মাতৃত্ব আর স্বামীর অক্ষত্রিয়োচিত আচরণে ক্ষুব্ধ জনার ব্যক্তিত্ব; তবু স্বামীর প্রতি ভালোবাসাতে তিনি মহীয়সী, গরিয়সী শৌর্যে, আর পুত্র হারানোর বেদনায় জীবনত্যাগের সিদ্ধান্তে তিনি শাশ্বত জননী। বিচক্ষণতা, তার্কিকতা ও সাহস—এই গুণগুলো তাঁর ব্যক্তি-স্বরূপকে দিয়েছে বীরাঙ্গনার উপযোগী দার্ঢ্য।

অতএব, উপসংহারে আমরা বলব, পত্রকাব্যের প্রতিটি শর্তই পূরণ করেছে 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। ব্যক্তিজীবনে যিনি মুহুর্মুহু চিঠি লিখেছেন প্রিয় বন্ধুদের, পত্রকাব্য রচনার সমস্ত শর্ত পালনে তাঁর ভুল না হওয়ারই কথা। বস্তুত বাংলা ভাষায় প্রথম এবং স্বরূপে অনন্য কাব্য রচনায় বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের কৃতিত্ব অত্যুচ্চস্তরীয় এবং ঐতিহাসিক।

Scanned with CamScanner

'বীরাঙ্গনা'র উদ্দেশ্যমূলকতা : নারী-জাগরণ

নিতান্তই সৃজনের আনন্দে উদ্বুদ্ধ হয়ে একজন কবি লিখবেন, নাকি আর্থ-সামাজিক বা অন্য কোনো নির্মাণাত্মক মনোভাব নিয়ে, তা নির্ভর করবে তাঁর কবি-আত্মার স্বরূপ ও প্রতীতির উপর। কিন্তু একই কবির কবি-আত্মার স্বরূপ বা প্রতীতিও পাল্টে যেতে পারে সময়ের প্রবাহে, যেমন গিয়েছে মধুসূদনেরই। নাটকগুলি কিংবা তাঁর তিলোত্তমা বা ব্রজাঙ্গনা তিনি লিখেছেন নিছক সৃজন-আনন্দের প্রেরণায়, অর্থাৎ সেখানে তিনি কলাকৈবল্যবাদী, কিন্তু 'মেঘনাদ বধ', 'বীরাঙ্গনা' কিংবা প্রহসনগুলি লেখার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে সৃজন প্রেরণার পাশাপাশি ক্রিয়াময় ছিল আরও বিশেষ উদ্দেশ্য।

বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে কাব্য রচনা কি গর্হিত? না, আদৌ তা নয়, শুধু খেয়াল রাখতে হবে উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে শিল্পের ন্যায় যেন লঙ্ঘিত না হয়, শিল্পকর্ম হিসাবে রচনাটি যেন হয়ে ওঠে রসোত্তীর্ণ।

'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার ক্ষেত্রে কবি-চিত্তে অভিনব কলাকৃতির লক্ষ্য ছিল অবশ্যই; বাংলা সাহিত্যে যা নেই, প্রাচীন রোমক কবি ওভিদের পত্রকাব্য 'হিরোইড্‌স'-এর আদর্শে তাই তিনি সৃজন করতে চেয়েছেন, কিন্তু এরই পাশাপাশি তাঁর এ উদ্দেশ্যও ছিল যে স্বাধীন—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে উদ্বুদ্ধ নারীর প্রতিচ্ছবি তিনি ধরে দেবেন এ কাব্যে যা সমকালীন নারী-ভাবনাকে প্রভাবিত করবে। তাঁর এ উদ্দেশ্য 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র শিল্পমূল্যের অপহ্নুতি ঘটিয়েছে কিনা, কাব্যমূল্য তথা কবি-কৃতিত্ব অনুধাবনের ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় এটাও।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ উনিশ শতকী মতবাদ। এই আধুনিক মতবাদকে রূপায়িত করার জন্য মধুসূদন ওভিদের প্রক্রিয়ায় ভারতীয় পুরাণ ও রামায়ণ-মহাভারত থেকে বেছে নিয়েছিলেন এগারোজন নারীকে। যে-যুগের নারী তাঁরা, স্বভাবতই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রশ্ন তখন ছিল না, তাই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মাইকেল অনেক ক্ষেত্রেই বদলে নিলেন পুরাণ-বৃত্ত। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কাহিনীতে বৃহস্পতিপত্নী তারার যে অবস্থান, মধুসূদন তাঁকে দাঁড় করালেন ঠিক তার বিপরীত বিন্দুতে, রামায়ণের কেকেয়ী-বৃত্তও পাল্টে নিলেন। রামায়ণে আছে দশরথ দুটি বর দেবেন বলে কৈকেয়ীকে অঙ্গীকার করেছিলেন, কিন্তু মধুসূদন দেখালেন দশরথ কৈকেয়ীকে কথা দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র ভরতকে যুবরাজপদে অভিষেক করবেন; রামায়ণের সূর্পণখাকেও বদলে নিলেন মাইকেল, রামায়ণের সূর্পণখা প্রথমে রামকে কামনা করেছিল, রামের স্ত্রী সঙ্গে আছে জেনে সে কামনা করে লক্ষ্মণকে; রাম হোক বা লক্ষ্মণ তার চায় পুরুষ, যা প্রমাণ করে সে কামুক, প্রেমিকা নয়, কিন্তু মধুসূদন রামের প্রসঙ্গ পুরো বাদ দিয়ে সূর্পণখাকে লক্ষ্মণের রূপমুগ্ধ রোম্যান্টিক নায়িকা করে তুলেছেন। মহাভারতে জাহ্নবী শান্তনুকে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু মধুসূদনের জাহ্নবীর মতো একদা-স্বামীকে প্রণাম করতে বলেননি। অভিশপ্ত উর্বশী স্বর্গত্যাগে ব্যথিত ছিলেন পুরাণকথায়, মধুসূদন অভিশাপকে আশীর্বাদ হিসাবে গ্রহণ করতে দেখিয়েছেন উর্বশীকে। পুরাণ-কথার এই পরিবর্তন তিনি অবশ্যই করেছেন স্বীয় উদ্দেশ্যকে রূপায়িত করতে। চিরাচরিত সংস্কারের চেয়ে যে প্রেম বড়, পতিশিষ্যের সঙ্গে প্রথানুযায়ী যে বাহ্যসম্পর্কই দাঁড়াক তার মূল্যে যে প্রেমকে অগ্রাহ্য করা যায় না, বরং প্রেমের জন্য যে যে-কোনো

Scanned with CamScanner

সংস্কারকেই কাটিয়ে ওঠা যায়, হৃদয়ার্তি-পূরণেই যে ব্যক্তির যথার্থ মুক্তি, তারার অবস্থান পাল্টে না নিলে তা মধুসূদন প্রতীয়ত করে তুলতে পারতেন না। তেমনি দশরথের বাগদান পূর্বেই না ঘটালে দাঁড় করাতে পারতেন না কৈকেয়ীর অভিযোগকে, রামের কথা বাদ না দিলে রূপমুগ্ধা নারীর প্রেমকে একনিষ্ঠ করে দেখাতে পারতেন না উত্তাল রোম্যান্টিকতায়।

বিশেষ উদ্দেশ্যে পুরাণকথার এই যে পরিবর্তন, একে দোষাবহ বলা যাবে না এইজন্য যে পুরাণের নবজন্মদানে কবির অধিকার আছে। নবযুগ পুরাণকে নতুন করে পর্যালোচনা করবে—আবিষ্কার করবে পুরনো-বৃত্তের নতুন তাৎপর্য—এটাই স্বাভাবিক। বস্তুত আপত্তি সেখানে নেই, আপত্তি থাকে নবোপস্থাপনা শৈল্পিক ন্যায়ে আগাগোড়া সুসংহত না হলে। 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র প্রত্যেক পত্রলেখিকার বাহ্যোপস্থাপনা যা-ই হোক, তাঁদের অন্তর্স্বরূপ বিকশিত হয়েছে শিল্প-ন্যায়সূত্রেই।

শকুন্তলাকে রাজা যে আশ্বাস দিয়ে এসেছিলেন, শকুন্তলা সেই আশ্বাস পূরণের জন্য অপেক্ষা করেছেন একান্ত চিত্তে, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও যখন তাঁর সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি, তখনই তাঁর উৎকণ্ঠা বেড়েছে। প্রতীক্ষা অধীর হয়েছে, মন হয়েছে ব্যাকুল। কালিদাসের শকুন্তলার মতো তিনি পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন হতে পারেননি, স্মৃতি ছড়ানো স্থানগুলি তাঁর ব্যথাকে করেছে দ্বিগুণিত। তবু সে ব্যথায় রোদনব্যাকুলা হতে গিয়েও শকুন্তলা অশ্রুপাত সংবরণ করেছেন প্রিয়সখী অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা ব্যথিত হয়ে রাজাকে ভর্ৎসনা করবেন ভেবে, ভেবেছেন গৌতমী যদি সব জেনে যান তবে কি হবে, আবার ভেবেছেন রাজা কি তবে ছলনা করলেন! লক্ষণীয় এমন একটি কথাও শকুন্তলা ভাবেননি বা বলেননি যা তাঁর মতো অবস্থায় ভাবা বা বলা অসঙ্গত ছিল।—পতি বৃহস্পতির শিষ্য সোমের প্রতি তীব্র প্রেমাপন্ন হয়ে তারা যে পত্র লিখেছেন সেখানেও অবৈধ প্রেম নিবেদনের জন্য লজ্জা ও বিবেকদাহের আবহ আছে, কিন্তু সেই লজ্জা ও বিবেকবাধা ভেঙেই তারা তাঁর প্রেমের প্রবাহ বইয়ে দিয়েছেন, প্রমাণ করে দিয়েছেন কোনো সংস্কারের মূল্যই প্রেমের চেয়ে বড় নয়। তারার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এইখানে আর এই স্বাতন্ত্র্যেই তিনি অকাতরে বলে গেছেন কবে, কখন সোমকে তাঁর ভালো লেগেছিল, কিভাবে তাঁর সে ভালোলাগা ভালোবাসায় পরিণত হয়ে চরিতার্থের পথ খুঁজেছিল। তিনি আরও বলেছেন সোমকে ভালোবাসার পর সোমপত্নী তারাদের বা রোহিনীকে তিনি সপত্নীসুলভ ঈর্ষা করেছেন, বলেছেন কিভাবে গোপনে প্রিয়কে তাঁর দেহমধু উৎসর্গ করতে চান, কিভাবে ত্যাগ করতে চান 'বৃথা কুল মানে'। কোথাও কোনো প্রসঙ্গই ছাড়েননি তারা, তাঁর পরিস্থিতিতে যা করা—যা বলা অনিবার্য, তা-ই তিনি করেছেন বা বলেছেন। বলেননি শুধু একটি কথা, বৃহস্পতিকে বাদ দিয়ে কেন তাঁর মন প্রধাবিত হল চন্দ্রের প্রতি। পুরাণ জানায় বৃহস্পতি বৃদ্ধ, তারা নবযুবতী, তবু মধুসূদন বৃহস্পতি সম্পর্কে তারার কোনো প্রতিবেদনা জানাননি, কিন্তু এ ত্রুটি কবির বিশেষ উদ্দেশ্যের কারণে ঘটেনি, এ তাঁর অবধারণার ত্রুটি।

দ্বারকানাথ কৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেই ভীষ্মকপুত্রী রুক্মিণী ভালোবেসেছিলেন, কিন্তু চেদীশ্বর শিশুপালের সঙ্গে তাঁর বিয়ে ঠিক হলে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি পত্র লিখেছেন। পত্রের অর্ধাংশ কৃষ্ণ সম্পর্কে তিনি কত কথা জানেন তারই মুগ্ধ বর্ণনা, বাকী অংশে তাঁর সমস্যা ও

Scanned with CamScanner

তার নিরাকরণের প্রার্থনা। দীর্ঘপোষিত প্রেমের কথা প্রথম বলতে বসে কুমারীর পত্রে আবেগের দোলা লাগবেই, মুগ্ধতাও বর্ণিল হবে শব্দে-শব্দে, সুতরাং সে-সব কথাকে অসংগত বলা যাবে না, অসংগত বলা যাবে না যাকে তিনি আত্মদান করতে চান তাঁকেই নিজের বিপদকথা জানানো ও তারই কাছে বিপন্মুক্তির প্রার্থনা করা। কবির উদ্দেশ্যমূলকতা শিল্পের বৈরিতা করেনি এখানেও।

কেকয়ী প্রসঙ্গে রামায়ণী তথ্যের সামান্য পরিবর্তন করেছেন মধুসূদন, কিন্তু কেকয়ীর যে চরিত্র তিনি চিত্রিত করেছেন উদ্দেশ্যমূলকতার কারণে তাতে শিল্পন্যায় লঙ্ঘন করা হয়নি কোনোখানেই। স্বামীর হঠকারিতায় পুত্রের ভবিষ্যৎ ভূলুণ্ঠিত হয়ে যেতে দেখে আহত মাতৃহৃদয় প্রতিবাদে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। পত্নী হিসাবে তিনি রাজাকে এই বলে আক্রমণ করেছেন যে গতযৌবনা-গতশ্রী বলেই রাজা তাঁকে অবজ্ঞা করতে পেরেছেন, নির্ভীকভাবে বলতে পেরেছেন রাজার 'ধর্ম শব্দমুখে, গতি অধর্ম পথে।' সপত্নী কৌশল্যার প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ করতে তিনি দ্বিধা করেননি, রাম বা সীতার প্রতিও অসুয়া প্রকাশ করেছেন, আবার রাজার ঐ সিদ্ধান্তের নির্মম প্রতিবাদ তিনি কিভাবে করবেন তাও জানিয়ে দিয়েছেন অকপটভাবে। উচ্চাশয়তা হয়তো তাঁর চরিত্রে নেই, কিন্তু একজন রক্তমাংসের নারীর বাস্তব মানসঅবয়বটি যথাযথভাবে রূপ পেয়েছে তাঁর চরিত্রায়নে।

দ্রৌপদী চরিত্রটি মধুসূদনের অভিনব রূপায়ণ। মহাভারতীয় ঘটনা নয়, মহাভারতীয় দ্রৌপদী চরিত্রের উপলব্ধি থেকে এ চরিত্রের সৃষ্টি। দ্রৌপদী সর্বংসহা সীতা নন, প্রচণ্ড আত্মসচেতন, কেউ তাঁর অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চনা করতে পারবে না, পারবে না তাঁর ব্যক্তিত্বকে আচ্ছন্ন করতে। অর্জুন, যাঁকে তিনি স্পষ্টতই পঞ্চস্বামীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন বলে জানাতে দ্বিধা করেননি, তিনিও স্বর্গে গিয়ে তাঁকে ভুলে থাকবেন তা-ও সহ্য করবেন না তিনি। ব্যঙ্গে, কটাক্ষে, সন্দেহে তাঁকে সতর্ক করে তুলেছেন তাঁর পত্রে, আবার ভালোবাসার দীর্ঘ ইতিবৃত্তও বলেছেন নম্র উচ্চারণে, দাবি করেছেন প্রতীক্ষা সয় না আর, উত্তর না দিয়ে অর্জুন নিজেই চলে আসুন তাঁর কাছে। তাঁর প্রতিটি কথা, কটাক্ষ, তাঁর প্রেম, তাঁর দাবি তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে চিনিয়ে দেয়, কিন্তু সেটা শিল্পের পথ লঙ্ঘন করে নয়, যথার্থ শিল্প প্রক্রিয়াতেই।—দ্রৌপদীর যে ব্যক্তিত্ব আছে, সেই ব্যক্তিত্ব নেই ভানুমতী বা দুঃশলার। স্বামীর কাছে তাঁরা দুজনেই বিনতা, তাছাড়া দুজনেই তাঁরা নিজ নিজ স্বামীর আসন্ন সর্বনাশের প্রাকমুহূর্তে পত্র লিখেছেন, এক্ষেত্রে সর্বনাশা পথ থেকে স্বামীকে ফিরিয়ে আনার জন্য তাঁরা সকাতর। ব্যক্তিত্বের প্রভা তাঁদের এইখানে যে তাঁরা উভয়েই নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য করে তুলতে চেয়েছেন যুক্তির সাহায্যে। যুক্তিই রেনেসাঁস তথা আধুনিকতার ধর্ম, যুক্তিই ব্যক্তিকে স্বাতন্ত্র্য দেয়, যেমন দিয়েছে এঁদের দুজনকেই। যুক্তিই তাঁদের সাহসিকা করে তুলেছে, নিজ নিজ স্বামীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কথা বলতে করে তুলেছে নির্দ্বিধ।

উর্বশী ও সূর্পণখার পত্র প্রেম নিবেদনের পত্র। দুজনেই রূপমুগ্ধ, পৌরুষে মুগ্ধ, দুজনেই নিজেদের হৃদয় আর দেহসুধা উৎসর্গ করতে চান তাঁদের দয়িতদের। এঁদের একজন বিধবা (সূর্পণখা), অন্যজন বহুভোগ্যা বারাঙ্গনা। লক্ষণীয় বৈধব্য বা বহুভোগ্যতা নিয়ে তাঁদের কোনো হীনমন্যতা নেই, আর এইখানেই সমযুগমানসিকতাকে তাঁরা আঘাত করেছেন

Scanned with CamScanner

সহজেই। তাছাড়া 'নারী তার প্রণয় ব্যক্ত করে ঈশারায়' এই চিরাচরিত ধারণাকেও ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে নিজেদের প্রেমানুভূতি খোলাখুলি বিন্যাস করে তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন নারীমুক্তির জন্য দরকার কোন্ স্বাতন্ত্র্যের এবং তা দেখাতে গিয়ে শিল্পবিধি থেকে তারা বিচ্যুত হয়নি কোথাও।

জাহ্নবীর পত্রটি বিস্ময়কর। শান্তনু একদা জাহ্নবীর স্বামী, অথচ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেই স্বামীকেই তিনি বললেন, 'প্রণম সষ্টাঙ্গে, রাজা।' গঙ্গা দেবী, শান্তনু মানুষ; সেইজন্য যে বিপ্লবী কণ্ঠ অনেকটা আস্তরণে চলে যায়, তাকেই কিন্তু মধুসূদন তুলে রাখতে চেয়েছেন যুগের সামনে।—গুণে সমন্বিতা নারী স্বামীর ভক্তি দাবি করতেই পারেন, তাতেই প্রতিষ্ঠিত হবে নারীমুক্তি। জনা স্বামীর ভক্তি দাবি করেননি, দাবি করেছেন কর্তব্যবোধ, আর স্বামীর কর্তব্যবোধের সঙ্গে নিজের কর্তব্যবোধ মেলেনি বলে তিনি শেষাবধি আত্মহত্যার মাধ্যমে স্বামীর মোহভঙ্গ করতে চেয়েছেন। ক্ষমা নয়, ভক্তিনত চিত্তে মেনে নেওয়া নয়, অর্জুনকে কেন্দ্র করে তাঁর মোহভঙ্গ ঘটাবার জন্য যুক্তির অবতারণা করেছেন—অর্থাৎ অর্জুন নররূপী নারায়ণ, যুক্তি দিয়ে তাঁর জন্ম, তাঁর মাতৃচরিত্র, স্ত্রীচরিত্র সব বিশ্লেষণ করে সে মোহের অসারত্ব প্রমাণ করে দিয়েছেন জনা। কোথাও অপ্রাসঙ্গিতা নেই তাঁর পত্রে, নেই এমন কোনো পংক্তি যা শিল্পের দাবি থেকে বিশ্লিষ্ট।

এই পর্যালোচনার নিরিখে, অতএব, এই সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতেই পারি যে যুগতাড়িত মহতী উদ্দেশ্য এ কাব্য রচনার নেপথ্যে কবিচিত্তে ক্রিয়াময় থাকলেও শিল্পের দাবিকে তিনি কখনোই উপেক্ষা করেননি; উদ্দেশ্য তার অস্থি, কিন্তু শিল্পই তার প্রাণ, তার সর্বাঙ্গের শ্রী।

Scanned with CamScanner

বীরাঙ্গনা কাব্য : পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবরেখা

পত্রকাব্য রচনার আদর্শ ভারতীয় সাহিত্যে ছিল না; মধুসূদনই বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম পত্রকাব্য রচয়িতা। প্রকরণটি তিনি পেয়েছিলেন ইতালীয় সাহিত্যে; ইতালীয় কবি পাবলিয়াস ওভেদিয়াস নাসো* (জন্ম ৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, মৃত্যু ১৭ খ্রীষ্টাব্দ)-র 'হিরোইডস্'ই তাঁর পত্রকাব্য রচনা-পরিকল্পনার উৎস।

'হিরোইডস্'-এ আছে মোট একুশটি পত্র। এর মধ্যে প্রথম পনেরোটি নিজ নিজ প্রিয়ের উদ্দেশ্যে পনেরোজন নায়িকার লেখা, শেষ ছ'টি তিন নায়ক ও তিন নায়িকার পারস্পরিক পত্র-বিনিময় (হেলেনের প্রতি প্যারিস : প্যারিসের প্রতি হেলেন; হিরোর প্রতি লিওনডার : লিওনডারের প্রতি হিরো এবং সিডিপির প্রতি অ্যাকনোলিয়াস : অ্যাকনোলিয়াসের প্রতি সিডিপি)।

মধুসূদন ভেবেছিলেন তিনিও একুশটি পত্রই রচনা করবেন, পারেননি সময়াভাবে। একটা তারিখহীন চিঠিতে বন্ধু রাজনারায়ণকে তিনি লিখেছিলেন—

"There are to be twenty-one Epistles, and I have finished eleven. These are being printed off, for I have no time to finish the remainder"...

পরে ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি গান্ধারী, অনিরুদ্ধের প্রতি ঊষা, যযাতির প্রতি শর্মিষ্ঠা, নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মী ও নলের প্রতি দময়ন্তী—এই পত্রগুলি তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু কোনোটাই শেষ করতে পারেননি।

ওভিদ তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছিলেন 'হিরোইডস্; এরই বাংলা তর্জমা করে মধুসূদন তাঁর কাব্যের নাম দিয়েছেন 'বীরাঙ্গনা কাব্য'। ওভিদের আশ্রয় পৌরাণিক নরনারী ও তাঁদের জীবনবৃত্ত; মধুসূদনেরও আশ্রয় ভারতীয় পুরাণের একাদশ নারী ও তাঁদের বৃত্তান্ত। পুরাণকে ওভিদ দেখেছিলেন নবীন দৃষ্টিতে, মধুসূদনও তাই করেছেন। এই তথ্যগুলি থেকে সততই মধুসূদনের উপর সুদূর অতীতের ঐ পাশ্চাত্ত্য কবির প্রভাব প্রতিভাত হয়ে যায়।

কিন্তু এ প্রভাব প্রাকরণিক, বা বহিরাবয়বিক; যে মুহূর্তে মধুসূদন ভারতীয় পুরাণকথাকে বিষয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সে মুহূর্তেই তিনি সরে এসেছেন ওভিদের জগৎ থেকে। তাছাড়া, ওভিদের কাব্যের 'থিম' হল প্রেম, তাঁর কাব্যের একুশটি পত্রের মধ্য দিয়ে প্রেমেরই ভিন্ন ভিন্ন রূপ, ভিন্ন ভিন্ন মনস্তত্ত্ব শিল্পায়ত হয়েছে, কিন্তু মধুসূদন তাঁর কাব্যে কেকয়ী ও জনার মতো এমন দু'জন নারীকে উপস্থিত করেছেন, প্রেম নয়, যাঁদের পত্র-প্রেরণা অপত্য-বেদনা। তাই তাঁর কাব্যের 'থিম' সম্পূর্ণত 'প্রেম' থাকেনি, হয়ে উঠেছে নারীর বিবিধ মনস্তত্ত্ব।

---

*ওভিদ আজ যতটা জনপ্রিয় বিগত শতাব্দী অবধি তার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় ছিলেন। পেত্রার্ক, বোকাচ্চিও, চসার, শেক্সপীয়ার, মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রমুখ কবিকুল বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রভাবে এসেছেন। 'হিরোইডস' পত্রকাব্যে তিনি পুরাণকথাকে যুগোপযোগী করে সৃজন করেন।— মধুসূদন ঠিক কবে তাঁর কাব্য পড়েছিলেন জানা যায় না। বিশপ্‌স কলেজে পড়ার সময় তিনি ল্যাটিন শিখেছিলেন, তবে তাঁর জীবনের সেই চরম দুর্বিপাকের সময় হয়ত এ কাব্য পড়েননি, ওভিদ সম্পর্কে তখন জেনে থাকলেও তাঁর গ্রন্থটি সম্ভবত পড়েছিলেন তিনি মাদ্রাজে বসে।

Scanned with CamScanner

তবু ওভিদের কাব্যের কোনো নারীর সমজাতীয় পরিবেশ-পরিস্থিতিতে যখন 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র কোনো নারী এসেছেন, তখনই তৈরি হয়ে গেছে বিষয়গত প্রভাবের ক্ষেত্র।

মহিষী ফিড্রার (Phaedra) সপত্নীপুত্র যুবরাজ হিপ্পোলিটাস (Hippolytus); তবু তাঁরই প্রতি তিনি প্রেমাপন্ন হয়ে পড়েন দারুণভাবে এবং তাঁর দেহমনের আর্তি ব্যক্ত করে অবশেষে লেখেন—

'No blame will you receive, but praise instead,
Safe at my side, and even in my bed.
Only make haste and straight our union seal,
Ere you, like me, be broken on Love's wheel.'

তাঁর এ কামনাতপ্ত আহ্বান সোমের প্রতি তারা অথবা লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পনখার বাসনাবিধুর আকুতি স্মরণ করিয়ে দেয়। পুরাণে তারার চরিত্র 'বীরাঙ্গনা'য় বর্ণিতের অনুরূপ ছিল না, ছিল প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত; হতে পারে যে ওভিদের এই ফিড্রার আদর্শেই মধুসূদন অনুরূপ কল্পনা করেছেন। রামায়ণের সূর্পণখায় কামোত্তেজ প্ররোচনা ছিল, কিন্তু মধুসূদন তাঁর যে অভিনব উপস্থাপনা করেছেন, তারও নেপথ্যে ফিড্রার আদর্শ ক্রিয়াময় থাকা অস্বাভাবিক না, যদিও লক্ষ্মণের সঙ্গে সূর্পনখার কোনো পূর্ব-পরিচয় পর্যন্ত নেই, কোনো অপত্য সম্পর্কের প্রশ্নই ওঠে না। ফিড্রার পত্র ছাড়া, ঈনিসকে লেখা দিদো-র, কিংবা ডেমোফুনকে লেখা রাণী ফিলিসের পত্রও তারা ও সূর্পণখার পত্র-রচনায় মধুসূদনের সৃজন কল্পনাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে বলে মনে হয়।

প্রটোসলিয়াসকে পত্র লিখেছিলেন সাধ্বী লাওডামিয়া, তিনি জানতে পেরেছিলেন ট্রয়ের মাটিতে যে প্রথম পা রাখবে তার নিস্তার নাই, যাঁর হাতে তিনি নিহত হবেন লাওডামিয়া সেই হেক্টরকে দেখতে পেয়েছিলেন স্বপ্নে। শঙ্কিত হয়ে তাই তিনি প্রিয় প্রটোলিয়াসকে প্রথমেই ট্রয়ে অবতরণ করতে বারণ করেছেন, গোপনে পালিয়ে আসাতে অনুরোধ করেছেন রণভূমি থেকে। বোঝাই যাচ্ছে, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী এবং জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলার পত্র দুটি লাউডামিয়ার পত্রের আদর্শে রচিত।

উত্তমর্ণ কবির কোনো কোনো চরিত্রের কোনো কোনো অনুভূতিও বেজে উঠেছে অধমর্ণের সৃজনবীণায়। প্রতীক্ষাব্যাকুলা ফিলিস (Phyllis) লিখেছিলেন :

"Oft have I thought the gusty breezes
of the South were bringing back your
white sails."

শকুন্তলার মধ্যেও আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা থেকে জন্ম নিতে দেখি ভ্রান্তি :

'হেরি যদি ধূলারাশি, হে নাথ, আকাশে;
পবন স্বনন যদি শুনি দূর বনে;
অমনি চমকি ভাবি, ...
পুরবাসী যত
আসিছে লইতে মোরে নাথের আদেশে!'

Scanned with CamScanner

আবার, একিলিস (Achilles) -কে ব্রিসেইস (Briseis) যেমন তাঁর বিরহতপ্ত শরীরের ক্ষীয়মানতা ও দীপ্তিহীনতার কথা জানিয়ে লিখেছিলেন—

'Gone is my flesh, and gone my colour, what spirit
I still have is but sustained by hope in vain.'

তেমনি প্রিয়ের সহানুভূতি কামনায় শকুন্তলাও লিখেছেন :

'মলিন বাকলে
আবরি মলিন দেহ; নাহি অন্নে রুচি'।

ফিলিস যেমন অভিমান করে ডেমোফুনকে বলেছিলেন—

'...Under your own image let be
inscribed these words; this is he whose wiles
betrayed the hostess that loved him.'

তেমনি ক্ষুব্ধ কেকয়ী দশরথকে বলেছেন—

'লিখিব গাছের ডালে নিবিড় কাননে
পরম অধর্ম্মাচারী রঘুকুলপতি!'

সাদৃশ্য যে অত্যন্ত নিবিড় তা হয়তো নয়, তবু প্রথমের চিন্তা পরবর্তীর ভাবকল্পনা খেলিয়ে যে তুলেছে নিকটে থেকেই, তাও অস্বীকার করা সহজ নয়। ওভিদ যে সময়ের কবি ইটালীর জনরুচিতে তখন অবক্ষয়ের সময়। সেই সময়-রুচিই প্রতিফলিত হয়েছে ওভিদের কাব্যে। মা (যদিও বিমাতা) কামার্ত প্রেম নিবেদন করছেন ছেলেকে, বোন প্রেম নিবেদন করছে ভাইকে, রাণী প্রেম নিবেদন করছেন পরপুরুষকে—নীতি-নৈতিকতার, পাপ বা অপরাধবোধের বা বিবেকদংশনের বালাই নাই। এও নয় যে গূঢ় কোনো ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চাপে অথবা বিদ্রোহী আত্মপ্রকাশের প্ররোচনায় তাঁরা আলোড়িত। আলোড়ন অপ্রতিরোধ্য শুধু তাঁদের কামনায়। আর, তাতেও কোনো পাঠক বিমুখ হননি ওভিদের প্রতি, উল্টে বাহবায় হয়েছেন উন্মুখর। পক্ষান্তরে, অধিকাংশ সমালোচকই 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'-র প্রশংসা করলেও সকলে অকুণ্ঠ হতে পারেননি। মধু-জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু স্বয়ং 'সোমের প্রতি তারা' পত্রটির প্রতি বিরূপ ছিলেন; দীননাথ সান্যাল এ-গ্রন্থের 'বিশদ শব্দার্থ ও টীকা' রচনা করেছেন ঐ পত্রটি বাদ দিয়ে। পরবর্তী অনেক সমালোচক যে বিশেষ উদ্যমে এ কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন সাহিত্যে একটি চরিত্রের অনৈতিকতার দায় রচয়িতার উপর বর্তায় না, তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে. রুচির প্রশ্ন তাঁদেরকেও ভাবিয়েছে। আমরা বলব, রুচির প্রশ্নকে তোয়াক্কা না-করার ক্ষেত্রে মধুসূদনের উত্তর যাই হোক, ক্রিয়ার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য কবির প্রভাবও নিশ্চয়ই ছিল। পাশ্চাত্ত্যের জীবনবেদ ক্রিয়াময় এ কাব্যের মূল দৃষ্টিভঙ্গিতেই।

বস্তুতঃ এ কাব্যের বিন্যাস (texture) ভারতীয়, কিন্তু আত্মা (spirit) প্রতীচ্য। বিন্যাস-ক্ষেত্রে এ কাব্যের নানা পত্রে ওভিদের কাব্যের যে প্রাসঙ্গিক প্রভাব লক্ষ করা গেছে, তার চেয়ে অন্তর্লীন এই প্রতীচ্য প্রভাবের মূল্য কম নয়, হয়তো বেশিই। কারণ, যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, যে অধিকারসচেতনতা এবং যে বাক্‌স্বাধীনতা এ কাব্যের প্রত্যেক নায়িকার মধ্যে ক্রিয়াময়, কেবল ওভিদ থেকে তা মধুসূদনে আসেনি, এসেছে তাঁর আজীবন পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় অনুপ্রাণনার ভিতর থেকে; আর, এই ভাবধারার অন্তঃক্রিয়াতেই প্রস্তুত হয়েছে বিন্যাসে ওভিদ তথা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ক্ষেত্র।

Scanned with CamScanner

পত্রলোচনা/চরিত্রবিচার

শকুন্তলা

'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র একাদশ নায়িকার মধ্যে সবচেয়ে নরম মনের, সবচেয়ে স্নিগ্ধ স্বভাবের নায়িকা দু'জন, একজন রুক্মিণী, অন্যজন শকুন্তলা। নিজের জন্য এঁরা যা চেয়েছেন তা অনন্যোপায় হয়েই; এঁদের কারোরই নেই তারার মতো মনস্বিতা, নেই কেকয়ী বা জনার মতো দার্ঢ্য, সূর্পণখা অথবা উর্বশীর মতো কামনামদির প্রেমেও উলসিত নন এঁরা, দ্রৌপদী-ভানুমতী-দুঃশলার মতো নেই অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি। রুক্মিণী চেয়েছেন প্রার্থিত পুরুষের সঙ্গে পরিণয় আর শকুন্তলা সব দিয়ে ও সব হারিয়ে শুধু স্ত্রী-স্বীকৃতির মধ্যে চেয়েছেন একটুখানি আশ্রয়।

শকুন্তলার জীবনবৃত্তের তথ্যচয়নে মধুসূদন আশ্রয় করেছিলেন মহাভারত—আরো বিশেষভাবে কালিদাসের ''অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটক কিন্তু মহাভারত বা কালিদাসের শকুন্তলার ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা তিনি দেননি তাঁর এ আশ্রমবালিকাকে। যে বিধিকে কবি চিরকাল মানবভাগ্য-নিয়ন্তা বলে মনে করেছেন তারই বিড়ম্বনায় আজীবন পীড়িত তাঁর শকুন্তলা; শকুন্তলা জানিয়েছেন—

'চির অভাগিনী আমি! জনক-জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে!'

শকুন্তলা নিশ্চয় জানতেন তাঁর পিতা ঋষি বিশ্বামিত্র এবং মাতা অপ্সরা মেনকা কারোর পক্ষেই তাঁকে লালন-পালন করা সম্ভব ছিল না, বস্তুত তাঁর জন্মও ছিল না তাঁদের ঈপ্সিত, কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য অথবা পরিস্থিতিগত বাস্তবতা যা-ই হোক, শকুন্তলার দিক থেকে তা বেদনাবহ, বিধি-বিড়ম্বিত। কিন্তু এই বিধি-বিড়ম্বনার দ্বিতীয় প্রসঙ্গ যা শকুন্তলা লিখেছেন এখানে—'পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে'—তা তাঁর মনের একটি গোপন প্রান্ত অনাবৃত করে দেয়, শকুন্তলা যাঁকে 'তাত' বলে সম্বোধন করেন, 'পিতৃষ্বসা' বলেন যাঁকে, সেই স্নেহপর ঋষি কণ্ব বা তাপসী গৌতমীকে তিনি 'পর' মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সুবিখ্যাত 'শকুন্তলা, মিরণ্ডা ও দেসদিমোনা' প্রবন্ধে শেক্সপীয়ারের নায়িকাদ্বয়ের সঙ্গে তুলনা করে দেখিয়েছিলেন শকুন্তলা নিষ্পাপ নন, রবীন্দ্রনাথও কামনার সন্তান হিসাবে তাঁর অন্তর্মনের গোপন ক্রিয়ার কথা বলেছিলেন, মধুসূদনের শকুন্তলাতেও দেখছি মুখে যা তিনি বলেন সেইটাই তাঁর শেষ কথা নয়। তিনি যখন প্রশ্ন করেন—

'আসিবেন তাত কণ্ব ফিরি যবে বনে;
কি কব তাঁহারে নাথ, কহ, তা দাসীরে?'

তখন সে-প্রশ্ন কতখানি 'তাত' কণ্বের প্রতি শ্রদ্ধায়, আর কতখানি নিষ্পাপ জিজ্ঞাসার ছলে দুষ্মন্তকে নিজ অভিলাষ পূরণে বাধ্য করার কৌশল তা নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এবং সে প্রশ্নের উত্তরও, আমরা মনে করি, অতি স্পষ্ট। মধুসূদনের শকুন্তলার আপাত সরল, আপাত অকপট কথার বিন্যাসের অনেকটাই তাঁর অভিলাষ-সিদ্ধির সুচতুর অভিযোজনা।

Scanned with CamScanner

সব কথা তাঁর অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত হয়ে আসেনি, অনেক কথাই তিনি সাজিয়েছেন। কথা যে সাজায়, জানতে হবে সে ভারী আত্মসচেতন। আত্মসচেতন মধুসূদনের শকুন্তলা এবং পৌরাণিক শকুন্তলার মধ্যে এই আত্মসচেতনতার প্রয়োগটাই মধুসূদনের লক্ষ ও লক্ষসিদ্ধির কৃতিত্বের দিক। বস্তুত এই আত্মসচেতনতাতেই তিনি আধুনিকাও। তাঁর কায়া পৌরাণিক, তাঁর আবেষ্টনও পৌরাণিক; কিন্তু তাঁর আত্মা আধুনিক।

পত্রে যত কথা শকুন্তলা লিখেছেন কোনোটাই তবু মিথ্যা নয়। একদা মৃগয়া উপলক্ষে বনে এসে রাজা দুষ্মন্ত কণ্বমুণির আশ্রম দর্শনে আসেন; সেখানে শকুন্তলার রূপ-লালিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেন এবং তাঁর যৌবনসুধায় তৃপ্ত হয়ে ফিরে যান রাজধানীতে। যাওয়ার সময় কথা দিয়ে যান রাণীর মতো সসম্মানে শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন তিনি অচিরাৎ। রাজার আগমন, শকুন্তলা-মিলন ও রাজধানী প্রত্যাগমনের সময় ঋষি কণ্ব আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলা যখন তাঁর পত্রখানি লিখছেন, তখনও কণ্ব তাঁর আশ্রমে ফিরে আসেননি। দুষ্মন্তের প্রস্থান এবং কণ্বের আগমনের পূর্বে এই আশ্রমে এসেছিলেন উগ্রতপা ঋষি দুর্বাসা এবং আতিথ্যের দায়িত্বে থাকা শকুন্তলা বিরহলীনা থাকায় ও তাঁকে স্বাগত না করায় শকুন্তলাকে তিনি অভিশাপ দেন যে যার কথা চিন্তা করে শকুন্তলা তাঁকে অবজ্ঞা করল সে তাকে বিস্মৃত হবে। কালিদাসের নাটকে আছে বিরহলীনা শকুন্তলা এ অভিশাপের কথাও জানতে পারেনি।

প্রশ্ন হল, মধুসূদনের শকুন্তলা দুর্বাসার আগমনের পূর্বেই তাঁর পত্রখানি লিখেছিলেন, না কি পরে? দুর্বাসা-শাপে শকুন্তলা-বিস্মৃতিই কি দুষ্মন্তের আশ্বাসভঙ্গের কারণ, নাকি এ নিছকই তাঁর ব্যস্ততাজনিত বিলম্ব? এ বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত শকুন্তলার পত্রে নেই। কালিদাসের নাটকে শকুন্তলা দুর্বাসার আগমন বা অভিশাপ-কথা জানতে পারেননি, সেই অনুসারে মধুসূদনের শকুন্তলার পত্রে দুর্বাসা প্রসঙ্গ অনুপস্থিত বলে অনেকে মনে করেন। কিন্তু আমরা লক্ষ করি, কালিদাসের শকুন্তলা এবং মধুসূদনের শকুন্তলার মধ্যে পার্থক্য অনেক। কালিদাসের শকুন্তলা এতটাই বিরহলীনা যে তিনি সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানাহত, কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা বিরহ-বেদনায় আচ্ছন্না হলেও বাহ্যজ্ঞানাহত নন; বায়ু-তাড়িত ধুলারাশি দেখে তাঁর ভ্রম হয় পুরবাসীরা তাঁকে নিতে আসছে, তাঁর এই ভ্রম দেখে অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদে এবং সে কান্নার সঠিক তাৎপর্য বুঝতেও শকুন্তলার অসুবিধা হয় না। 'স্রোতোনাদ' শুনে তাঁর মনে হয় বনদেবতা বুঝি রাজার নিন্দা করছেন এবং আশঙ্কা হয় রাজাকে 'পাছে তিনি শাপ দেন রোষে'। তাঁর প্রসাধনহীন উন্মন দশা গৌতমী লক্ষ করেন না তপজপে মগ্ন থাকেন বলে, অন্যথায় যে অনর্থ হত তাও বোঝার শক্তি শকুন্তলার লোপ পায়নি। সচেতন মনের এই পর্যবেক্ষণ ও ভাবনা প্রমাণ করে কালিদাসের শকুন্তলার মতো দুষ্মন্ত-বিরহে সম্পূর্ণ বাহ্যজ্ঞানলুপ্ত নন মধুসূদনের শকুন্তলা।

দুষ্মন্তের আশ্বাস পূরণের প্রতীক্ষায়, বেদনায় ও উদ্বেগে যখন তাঁর দিন কাটছে তখনও পরিপার্শ্বের প্রতি রয়েছে তাঁর সজাগ দৃষ্টি। সেক্ষেত্রে দুর্বাসা ইতিমধ্যে এসে থাকলে ও অভিশাপ দিয়ে থাকলে তারও কথা শকুন্তলার পত্রে উপস্থিত থাকত বলে মনে হয়। পত্রটিকে তাই আমরা দুর্বাসার আগমনপূর্ব সময়ে লেখা বলেই মনে করি।

Scanned with CamScanner

শকুন্তলার পত্রে যে উদ্বেগ ও আকুলতা ব্যক্ত হয়েছে অনেকে তার তীব্রতার পিছনে তার অন্তঃসত্ত্বাদশাকে বড় করেন বলে মনে করেন। কিন্তু এ নিছকই কল্পনাবিলাস। শকুন্তলা তাঁর পত্রে কোথাও এ প্রসঙ্গে না একটি কথা বলেছেন, না সে সম্বন্ধে কোনো আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। কালিদাসের নাটকেও শকুন্তলা তাঁর গর্ভাধান সম্পর্কে ছিলেন অনবহিতা; তাত কণ্ব আশ্রমে ফিরে আসার পর তাঁর দেহে গর্ভলক্ষণ লক্ষ করেন এবং সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে তাঁকে রাজসমীপে প্রেরণের উদ্যোগ নেন। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা পত্র লিখে এবং পত্রে বেদনা-সংবেদনার নানা উদাহরণ, বহুল স্মৃতি ও কূটৈষা-গূঢ়ৈষার নানা প্রসঙ্গ লিপিত করে দুষ্মন্ত কর্তৃক গৃহীত হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন নিজেই। তিনি যদি জানতেন যে রাজার সন্তান তাঁর গর্ভে, তাহলে রাজ্ঞী হিসাবে গৃহীত হওয়ার পক্ষে সেই জোরালো প্রসঙ্গ তিনি অবশ্যই লিখতেন। এ কারণে লেখেননি যে, মনে হয়, তিনি নিজেও তখনও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না।

তাহলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছি যে 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের শকুন্তলা দুষ্মন্তের প্রস্থানের অল্প কিছুদিন পরেই তাঁর পত্রটি রচনা করেছেন, তখনও দুর্বাসা আসেননি সেই আশ্রমে, এবং শকুন্তলা জানেননি তাঁর গর্ভসঞ্চার-কথা। সেদিক থেকে প্রতীক্ষা তাঁর দীর্ঘ নয়, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি যে এতটা ব্যাকুলা; তার কারণ একটাই : তিনি আধুনিকা এবং আধুনিকা হিসাবে নিজ অধিকার সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। পত্রে তিনি লিখেছেন বটে—

"নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসীভাবে পা-দুখানি—এই লোভ মনে—
এই চির-আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!"

কিন্তু এ বিনয়ের অনেকটাই তাঁর অবস্থাগত কারণে; তিনি জানেন যে তিনি 'পরান্ন-পালিতা', অসহায়, রাজাকে কর্তব্য পালনে বাধ্য করার ক্ষমতা তাঁর নাই; অন্যথায় যে নারী সসাগরা ভারতবর্ষের অধীশ্বরকে নির্দ্বিধায় বলতে পারেন 'গান্ধর্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে', কিম্বা সরস পত্রের প্রতি সমীরণের আকর্ষণ ও তার শুষ্কতায় পরিত্যাগের উপমা দিয়ে রাজাকে যিনি প্রকারান্তরে রূপমেদুর বলেন মুখের উপরেই, তিনি যে দাসী মনোভাবাপন্ন নন, তা স্বতোস্পষ্ট। ড. বিপ্লব চক্রবর্তী শকুন্তলা প্রসঙ্গে লিখেছেন—'একদিকে ছলনা, অন্যদিকে প্রেম ও জীবনের আহ্বান। একদিকে স্বপ্নসুখের শিহরণ, অন্যদিকে জাগরণে হতাশা। একদিকে প্রত্যাশার বিস্তার, অন্যদিকে শূন্যপ্রাপ্তির ক্ষোভ। বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনাভারকে তাই শকুন্তলা পত্রে কবি উজার করে দেন শকুন্তলার মন ও প্রাণের ভাষা বিস্তারে।" (দ্র. শকুন্তলা পত্রিকা অথবা দাসী কথিকা/বীরাঙ্গনা কাব্য-চর্চা/সম্পাদনা : উজ্জ্বলকুমার মজুমদার/পৃ. ১৮৬) যে নারীর অবচেতনায় 'স্বপ্নসুখের' আকাঙ্ক্ষা আছে, ন্যায্য প্রাপ্যের অপ্রাপ্তিজনিত 'ক্ষোভ' আছে, সে নারীর পত্রকে কেন ড. চক্রবর্তীর 'দাসী-কথিকা' মনে হল, তাঁর মনস্তত্ত্বকে মনে হল দাসী-সুলভ, তার যুক্তি নেই। বস্তুত শকুন্তলার মনস্তত্ত্ব যদি দাসী-সুলভ হত তবে একটু ঘুমোলেই তিনি দুষ্মন্তের বৈভবপূর্ণ রাজপুরী, রাজসভা আর স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন স্বয়ং রাজাকে স্বপ্নে দেখতেন না। স্মরণ্য যে বাস্তবে এগুলোর কোনোটিকেই তিনি দেখেননি; রাজাকে তিনি দেখেছিলেন আশ্রমে সর্ব-ঐশ্বর্য বিচ্ছিন্নভাবে (মহাভারত বা কালিদাসের নাটকে আছে অস্ত্র, রাজোষ্ণীষ প্রভৃতি সারথির কাছে রেখে

Scanned with CamScanner

দুষ্মন্ত পদব্রজে এসেছিলেন আশ্রমে; শকুন্তলা তাঁকে রাজা বলে ভাবতেও পারেননি, তবু যে তিনি অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নতত্ত্বের নিয়মে সেটা সম্ভব হত না যদি চেতন অথবা অবচেতন মনে শকুন্তলা তা কখনো কল্পনা না করতেন। তা যদি হয়, তবে প্রশ্ন, শকুন্তলা প্রেমিক দুষ্মন্তের প্রেমাদরের কথা কল্পনা না করে তাঁর রাজৈশ্বর্য কল্পনা করতে গেলেন কেন। এ প্রশ্নের উত্তরেই বেরিয়ে আসছে তাঁর মনের গোপন আকাঙ্ক্ষা : ঐ রাজহর্ম্য, রাজসভা, রাজা—সবার উপরে তাঁর অধিকার লাভের গূঢ়ৈষা। সুতরাং, 'সেবিবে দাসীভাবে পা দুখানি'—এটাই শকুন্তলার অন্তরের শেষ কথা নয়, হতে পারে তার আদর্শের কথা।

কিন্তু এই আদর্শটাই যদি শকুন্তলার মৌল স্বরূপ হত, তবে তাকে আমরা মধ্যযুগীয় জীবনবোধের বাহিকা বলতাম, আধুনিকা বলতাম না। প্রেম, আধুনিক নারীরও প্রার্থিত, কিন্তু অধিকতর প্রার্থিত গুণ-মান-ধনে ঋদ্ধ পুরুষের প্রেম। শকুন্তলার মনোগত প্রার্থনাও তা-ই, এবং তাঁর প্রার্থিত যা-কিছু সবই তিনি পেয়ে গেছেন, পেয়েও আটকে আছে শুধু দুষ্মন্তের আশ্বাস পূরণে বিলম্বের জন্য। তাই দুষ্মন্তের জন্য তার যেমন প্রেম ও তীব্র বিরহবোধ আছে, তেমনি তাঁর প্রতি তার ক্ষোভও নিরতিশয়।

প্রেমের কথা, বিরহের কথা শকুন্তলা স্পষ্টত বলেছেন, কিন্তু ক্ষোভের কথা স্পষ্টত বলেননি, তা ব্যক্ত হয়েছে আভাসে-ইঙ্গিতে, ক্বচিত 'গান্ধর্ববিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে'-এর মতো স্পষ্টতায়। এই ক্ষোভকে তিনি আড়াল করে রেখেছেন—আগেই বলেছি—তাঁর দীনতম পরিস্থিতি ও অসহায়ত্বের কারণে এবং এ-কারণেই তাঁর অধিকারের দাবিকে তিনি পেশ করেছেন যাঞ্চার প্রক্রিয়ায়। তবু লক্ষণীয় ঐ যাঞ্চাটি ছাড়া সারা পত্রই দুষ্মন্তের প্রতি তাঁর অভিযোগে ভরা। সাধারণভাবে এ পত্র তাঁর দুঃখ-যাতনার বর্ণনা, কিন্তু সমস্ত বর্ণনার নিহিত লক্ষ্য একটাই, রাজাকে জানানো যে তাঁর যাবতীয় দুঃখ-যাতনার জন্য দায়ী তিনিই। পত্রের অনুপুঙ্খ-পাঠে সেটা লক্ষ করা যেতে পারে—

শকুন্তলা তাঁর পত্র শুরু করেছেন রাজাকে প্রণাম নিবেদন করে। সকলেই বলেছেন ভারতীয় স্ত্রীর সনাতন আদর্শই এর প্রবর্তনা, আমরাও তা অস্বীকার করছি না, কিন্তু আমাদের প্রশ্নঃ শকুন্তলা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে কেন 'বননিবাসিনী দাসী' বললেন? কেন সরলভাবে শুধু নিজের নাম বা অন্য পরিচয়বাচক শব্দ ব্যবহার করলেন না? আসলে ঐ বাকবন্ধেই শকুন্তলা দুষ্মন্তকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন যে রাজার পত্নী হয়েও আজও তিনি বননিবাসিনী, এবং সেটা দুষ্মন্তের আশ্বাসভঙ্গের জন্যই। অর্থাৎ প্রণামের মধ্যেও তিনি অভিযোগ করেছেন দুষ্মন্তের বিরুদ্ধে এবং এই অভিযোগই পরের বাক্যে সোচ্চার—

'যদিও তুমি ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু পারে কি অভাগী?'

দুষ্মন্ত কথা দিয়ে গিয়েছিলেন রাজধানীতে ফিরে অবিলম্বে শকুন্তলাকে রাণীর মতো সসম্মানে রাজ-অন্তঃপুরে নিয়ে আসার জন্য দাস-দাসী-সৈন্য-সামন্ত সহ পুরবাসীদের পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তাঁর প্রত্যাগমনের পর প্রয়োজনীয় সময় কেটে গেছে—শকুন্তলাকে নিতে আসেনি কেউ। তাই দীর্ঘশ্বাস ঝরছে শকুন্তলার—

'হায়, আশা মদে মত্ত আমি পাগলিনী!'

Scanned with CamScanner

এই দীর্ঘশ্বাসও প্রকারান্তরে রাজারই প্রতি নির্দোষ অভিযোগ। আশা কে জাগিয়েছিলেন? রাজা। কেন শকুন্তলা পাগলিনী?—রাজার মিথ্যা আশ্বাসকে বিশ্বাস করায়। সুতরাং তাঁর এ পাগলিনী দশার জন্যও দায়ী রাজাই। কিন্তু শকুন্তলা কেকয়ী বা জনার মতো দার্ঢ্যপূর্ণা নন; এখনো তাঁর সর্বনাশও চরম হয়ে যায়নি; এখনো হয়তো আশা আছে রাজার আশ্বাস পূরণের। প্রতিবাদে সোচ্চার হলে সেই সম্ভাবনাটি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই তিনি অভিযোগ করেন দুর্ভাগ্য-যন্ত্রণার ভাষায়, আবার ঠিক তার পরেই দুষ্মন্তের সহানুভূতি জাগিয়ে তোলার জন্য নিজের যন্ত্রণার মর্মস্পর্শী বর্ণনা দেন। আকাশে ধুলো উড়তে দেখলেই তাঁর মনে হয় যে রাজার পাঠানো সৈন্য-সামন্ত-দাস-দাসী হাতি-ঘোড়া নিয়ে আসছে তাঁকে নিয়ে যেতে। তাঁর নিরাধার বিশ্বাসজাত এই ভ্রম দেখে 'নীরবে ধরিয়া গলা কাঁদে প্রিয়ম্বদা./কাঁদে অনুসূয়া সই বিলাপি বিষাদে!"

স্বামীর সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টায় পত্নীর আত্মদীনতা প্রকাশ পায়। শকুন্তলার ক্ষেত্রে এই দীনতা সত্য, আগেই বলেছি, এ তাঁর পরিস্থিতির দায়, আবার এ তাঁর অধিকার আদায়ের কৌশলও। এই কৌশলের আর একটি দিক দুষ্মন্তের মনে শকুন্তলার প্রেমের স্মৃতি জাগিয়ে তোলার চেষ্টা। শকুন্তলা সে চেষ্টাও করেছেন, যেমন—

"দ্রুতগতি ধাই আমি সে নিকুঞ্জবনে,
যথায়, হে মহীনাথ, পূজিনু প্রথমে
পদযুগ;"

—সেখানে কুসুম আজও ফুল্ল, লতাকুল মুকুলিত, অলিরা গুঞ্জরণ করছে সেখানে আজও সেদিনেরই মতো; মালিনী ছড়াচ্ছে তরঙ্গধ্বনি, পাতায়-পাতায় মর্মর, বৃক্ষশাখায় কপোতীর মুখে মুখ দিয়ে কপোত কূজনে মত্ত প্রেমালাপে। অথচ শকুন্তলা একা। বেদনায় তিনি হর্ষিত প্রকৃতি, মৃদুপবন ও পিককে প্রশ্ন করেছেন—

'কে করে আনন্দধ্বনি নিরানন্দকালে?'

এই প্রশ্নে রাজাকে শকুন্তলা আবার জানালেন যে তাঁর 'নিরানন্দ কাল' চলছে এবং সেটা তাঁরই জন্য। জানালেন, তাঁর দুঃখে বনদেবী পর্যন্ত কাঁদতে পারেন; রাজা কেন তবে সংবেদনাহীন? রাজা যে নিন্দা ও অভিশাপের যোগ্য আচরণ করেছেন তাও প্রকারান্তরে জানিয়ে দেন শকুন্তলা—

শুনি স্রোতোনাদ ভাবি—গম্ভীর নিনাদে
নিন্দিছেন বনদেব তোমায়, নৃমণি—
কাঁপি ভয়ে—পাছে তিনি শাপ দেন রোষে।'

কথাকে অলৌকিকতার স্তরে তুলে নিয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজাকে কি এই ভয়ও দেখাচ্ছেন শকুন্তলা যে বনকন্যা হিসাবে তাঁর দুঃখে সমব্যথী বনদেবতা রাজাকে অভিশাপ দিতে পারেন? শকুন্তলার এ অলৌকিক বিশ্বাস রাজাকে যদি স্পর্শ নাও করে, তবে এ অভিযোগ কি তাঁকে স্পর্শ করবে না যে সমীরণ যেমন পত্রের যৌবনলোভী, তেমনি রাজাও শকুন্তলার যৌবনলোভী এবং তার যৌবনসুধা পান করে তাকে তিনি ত্যাগ করেছেন? একই অভিযোগ তিনি আবার করেছেন স্মৃতির সরণী উজ্জ্বল করে। কালিদাসের নাটকে আছে, রাজা যখন গাছের আড়াল থেকে শকুন্তলাকে প্রথম দেখছিলেন

Scanned with CamScanner

তখন একটি ভ্রমর শকুন্তলার ঠোঁটকে ফুল ভেবে বার বার তাঁর ঠোঁটের ওপর বসবার চেষ্টা করছিল, শকুন্তলা তখন বলে উঠেছিলেন, কেউ কি নেই যে এই দুর্বৃত্তের আক্রমণ থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারে। রাজা তখনই বেরিয়ে এসেছিলেন তাঁকে রক্ষা করার জন্য। মধুসূদনের শকুন্তলা যেন সেই স্মৃতি থেকেই শিলীমুখকে বলেছেন, 'আসি তুমি আক্রম গুঞ্জরি/এ অধর পুনঃ!' কিন্তু এরপরই তিনি বলেন—

'কিন্তু বৃথা ডাকি, কান্ত। কি লোভে ধাইবে
আর মধুলোভী অলি এ মুখ নিরখি,—
শুখাইলে ফুল, কবে কে আদরে তারে?'

যে অভিযোগ শিলীমুখের প্রতি, সে-ই অভিযোগ আসলে দুষ্মন্তেরই প্রতি। কিন্তু এই যে শকুন্তলা বার বার নিজের রূপ ঝরে যাওয়ার কথা বলছেন, কেন, কিসে রূপ ঝরে গেছে তাঁর? কল্পনা করা যেতে পারে সেটাই তাঁর দেহের মাতৃত্ব লক্ষণ। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, শকুন্তলা যদি জানতেন যে তিনি অন্তঃসত্ত্বা, তবে তা তাঁর অভিযোগ পত্রে অতি গুরুত্বে বর্ণিত হতই, অন্যথা এ চরিত্রের সংহতি (integration)-ই নষ্ট হত। তাহলে কিসে তাঁর রূপ ঝড়ল? বিরহে। বিরহের দশ দশার কথা, 'ব্রজাঙ্গনা' লিখে ওঠা কবির অজানা ছিল না। রূপের ঐ দীপ্তিলোপই তাই জানিয়ে দিচ্ছে শকুন্তলার বিরহ-যন্ত্রণা অতীব গভীর। তারই সঙ্গে মিলেছে পরিত্যক্ত হয়ে থাকার সংক্ষোভ ও উদ্বিগ্নতাও।

বিরহ-আবহেই শকুন্তলা বার বার প্রবেশ করেন স্মৃতিরাজ্যে। রাজাকে কৌশলে গঞ্জনা দেওয়ার পর মুহূর্তেই তিনি আবার স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন; চলে আসেন সেই স্থানে যেখানে বসে পদ্মপত্রে তিনি রচনা করেছিলেন প্রিয়-আবাহন লিপি, যেখানে ঘটেছিল দুষ্মন্তের বিরহমুক্তি। সেই স্থানে বসে এখনো তিনি পদ্মপত্রে লিখে যান অজস্র লিপি, বায়ুকে অনুরোধ করেন সেইসব পত্র উড়িয়ে দুষ্মন্তের কাছে নিয়ে যেতে, কখনো অনুরোধ করেন তাঁর পালিত কুরঙ্গকেও।

শকুন্তলা লিখেছেন অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা ছাড়া আর কেউ এ আশ্রমে তাঁদের গান্ধর্ব-বিবাহ তথা প্রেমের ইতিবৃত্ত জানে না। কিন্তু এঁরা কাছে আসলেই তাঁকে চোখের জল মুছে ফেলতে হয়, অন্যথায় তাঁর দুঃখে ব্যথিত হয়ে তাঁরা রাজার নিন্দে করে, মন্দ কথা বলে তাঁর সম্পর্কে এবং তাতে শকুন্তলার 'বজ্রসম অপবাদ বাজে পোড়া বুকে!' যে রাজার জন্য তাঁর এত কষ্ট, প্রিয় সখীরাও তাঁর সম্পর্কে মন্দ কথা বললে রাগে তাঁর বুক ফাটে, মুখে কথা সরে না। এরই নাম প্রেম।

কিন্তু রাজার আচরণে অনুসূয়া-প্রিয়ংবদারাও যে মন্দ কথা বলে রাজাকে তা জানানো হয়েছে এই বাক্‌চাতুরিতেই, আবার সেই সঙ্গে জানানো হয়েছে তাঁর প্রেমার্ত মনের বিচিত্র বিক্রিয়াও। শকুন্তলা আরো জানিয়েছেন বিরহতাপিত উন্মন বিচরণে, কখনো বা তিনি চলে আসেন সেই তরুমূলে যেখানে 'গান্ধর্ববিবাহচ্ছলে' রাজা তাঁকে ছলনা করেছেন। বস্তুত শকুন্তলা ভুলতে পারেন না যে রাজা তাঁকে প্রবঞ্চনাই করেছেন, কিন্তু অভিযোগকেই তিনি তাঁর পত্রের একমাত্র বক্তব্য করতে পারেন না, কারণ অভিযুক্তের কাছেই রয়েছে তাঁর প্রত্যাশা। তাই ক্ষোভকে সংযত করে তিনি রাজার অনুভূতিকেই জাগিয়ে তুলতে

Scanned with CamScanner

চান—'কি ভাব উদয়ে মনে, দেখ মনে ভাবি,/ধীমান, যখন পশি এ নিকুঞ্জ ধামে।' রাজার অনুভূতি জাগবে কিনা শকুন্তলা জানেন না; বস্তুত কোথাও কোনো নিশ্চয়তা নেই, তাই, বিধাতাকে স্মরণ করে ঝরে পড়ে তার নিরুপায় দীর্ঘশ্বাস—

হে বিধাতঃ, এই কিরে ছিল তোর মনে?
এইকি রে ফলে ফল প্রেমতরু শাখে?

বিরহের এ হতাশ্বাস শকুন্তলাকে যে অবস্থায় নিয়ে যায়, কবি তার বর্ণনা দিয়েছেন যেন বিরহিনী নায়িকার শাস্ত্রকথিত বৈশিষ্ট্য মেনেই। প্রসাধনে মন নেই, অন্নে রুচি নেই, মনোদশা উদাসীন, সর্বদা বিষাদে ঝরে দীর্ঘশ্বাস, মাঝে মাঝেই জ্ঞান হারিয়ে হন ভূলুণ্ঠিতা। জ্ঞান যেই ফিরে আসে অমনি বাহু বাড়িয়ে খোঁজেন প্রিয়তমকেই এবং তাঁকে না পেয়ে হাহা রবে কেঁদে ওঠেন।—কি পাপে তাঁর এ বিড়ম্বনা, তা তিনি কাকে জিজ্ঞাসা করবেন? বস্তুত এ জিজ্ঞাসাও তিনি করছেন রাজাকেই। কারণ, পাপ তো তিনি করেননি, রাজার ঔদাসীন্যেই তাঁর এই যন্ত্রণা।

শকুন্তলা তাঁর পত্রে আরো লিখেছেন যে, বিরামদায়িনী নিদ্রাদেবীর কৃপায় যদি তাঁর ঘুম আসে কখনো, ভীড় করে আসে স্বপ্ন। তিনি স্বপ্ন দেখেন বিশাল বৈভবপূর্ণ রাজসভায় স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন দুষ্মন্ত। আগেই বলেছি, শকুন্তলার এ স্বপ্নে তাঁর যে অবচেতনা প্রতিফলিত হয় তাতে বৈভবী রাজার স্ত্রী হতে পারার আকাঙ্ক্ষা আছে, যদিও মুখে তিনি দুষ্মন্তকে জানিয়েছেন—

'নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসীভাবে পা দুখানি—এই লোভ মনে—
এই চির আশা নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!'

এবং প্রার্থনা করেছেন 'কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে!' 'তব পদে' বা 'ঐ পদে' নয়, 'রাজপদে'; এই 'রাজপদ' শব্দটি আবার জানিয়ে দিচ্ছে যে শকুন্তলা কখনোই ভুলতে পারেন না যে তাঁর স্বামী রাজা। আর সেই বোধের ফলেই স্বামীর কাছে স্ত্রীর অধিকার তিনি দাবি করতে পারেন না যথার্থ আত্মমর্যাদার সঙ্গে, তাঁর কণ্ঠে আসে অবাঞ্ছিত দীনতা—

"চির-অভাগিনী আমি! জনক জননী
ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি কি পাপে?
পরান্নে বাঁচিল প্রাণ—পরের পালনে!
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি
প্রাণপতি?

আশ্রমপালিতা হলেও শকুন্তলা বাক্‌নিপুণা। দীনতাকে তিনি মুহূর্তে আবৃত করে দেন আর্ত অনুযোগে—

"এ মনে যে সুখপাখী ছিল বাসা বাঁধি
কেন ব্যাধবেশে আসি বধিলে তাহারে
নরাধিপ?'

এই অনুযোগের পরই সুকৌশলে রাজাকে তিনি দাঁড় করিয়ে দেন তাঁর অপরাধ ও বিবেকের মুখোমুখি, প্রশ্ন করেন তাত কণ্ব আশ্রমে ফিরে এলে তাঁকে তিনি কি বলবেন,

Scanned with CamScanner

কি বলবেন যখন অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা রাজা সম্পর্কে মন্দ কথা বলবেন। কিন্তু এ চতুর আক্রমণেই শকুন্তলা তাঁর পত্র শেষ করেননি, শেষ করেছেন, নিজের বেদনা-বিবরণে—

'কহ, কি বলিয়া, দেব, হায়, বুঝাইব
এ পোড়া পরাণ আমি—'।

শকুন্তলার পত্র পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে বোধক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি বিরহাতুরা কিন্তু একই সঙ্গে রাজার প্রতি তিনি যথেষ্ট ক্ষুব্ধও। তবে সে ক্ষোভকে তিনি জনা বা কেকয়ীর ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন না কারণ দুষ্মন্ত সসাগরা ভারতের অধীশ্বর আর তিনি পিতৃ-মাতৃ-পরিত্যক্তা আশ্রমপালিতা এক ভাগ্যদীনা মেয়ে। নিজের এ দীনদশার জন্যই অন্তরে পুঞ্জিত ক্ষোভকে আড়ালে রেখে তাঁর কষ্ট ও যন্ত্রণার কথাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি, যদিও পুঞ্জিত ক্ষোভ, আভাসিত হয়ে পড়েছে বার বার। আর, জীবনাদর্শ হিসাবে স্বামীর পদপ্রান্তে আশ্রয় চাইলেও তাঁর মনের নিভৃতে রাজ্ঞী সম্মানের অভিলাষও রয়ে গেছে।—বাকচতুরা তিনি, অভিযোগের পরেই বেদনার কথা বলে, নিজের ক্ষোভের কথা অনুসূয়া-প্রিয়ংবদা বা তাত কণ্ব-গৌতমীর প্রসঙ্গে উপস্থাপনা করে কিম্বা অনুযোগকে আক্ষেপ বা দুর্ভাগ্যের ছলে তুলে ধরে বিমনা দয়িতকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন প্রতিশ্রুতি পালনে। উচ্চারণ অতি নম্র, কিন্তু দারুণ মর্মস্পর্শী—সনাতনের অবয়বে তিনি আধুনিকা।

Scanned with CamScanner

মধুসূদন দত্তের

বীরাঙ্গনা কাব্য

সম্পাদনা

কৃষ্ণগোপাল রায়

Scanned with CamScanner